সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ›› তৃতীয় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ›› মার্চ-এপ্রিল ২০১৭ ›› পাঁচ টাকা

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে নারী পৃষ্ঠা ৩

স্ট্যালিনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ পৃষ্ঠা ৪

কেমন পাঠ্যপুস্তক চাই পৃষ্ঠা ৫

ট্রাম্প যুগের রাজনীতি পৃষ্ঠা ৮

মার্কস আবিষ্কার করেছিলেন মানব ইতিহাসের বিকাশের সূত্র

(১৯৮৩ সালের ১৭ মার্চ কার্ল মার্কসের সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস যে বক্তব্য দেন, কার্ল মার্কসের ১৩৪তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর সুমহান সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা বক্তব্যটি প্রকাশ করলাম)

১৪ মার্চ, বেলা পৌনে তিনটায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক চিন্তা থেকে বিরত হয়েছেন। মাত্র মিনিট দুয়েকের জন্য তাঁকে একা রেখে যাওয়া হয়েছিল। আমরা ফিরে এসে দেখলাম যে তিনি তাঁর আরামকেদারায় শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন, কিন্তু ঘুমিয়েছেন চিরকালের জন্য।

এই মানুষটির মৃত্যুতে ইউরোপ ও আমেরিকার সংগ্রামী প্রলেতারিয়েত *(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

রাজস্ব বৃদ্ধি ও সিলিন্ডার ব্যবসায়ীদের স্বার্থেই গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি

বামপন্থীদলগুলোর হরতাল-জ্বালানি মন্ত্রণালয় ঘেরাওয়ে নজিরবিহীন পুলিশি হামলা

১৫ মার্চ বামপন্থিদলগুলোর জ্বালানি মন্ত্রণালয় অভিমুখে মিছিল

মাসখানেক আগে গত জানুয়ারিতে তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি আহুত হরতালে পুলিশি তাণ্ডবের দগদগে স্মৃতি জনমানুষের মন থেকে মুছে না যেতেই আবারও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশের হামলা-নির্যাতন প্রত্যক্ষ করলো দেশবাসী। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা ও সিপিবি-বাসদ আহুত হরতালের সমর্থনে প্রগতিশীল ছাত্র জোট ঢাকার শাহবাগে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সমাবেশ করছিল। কিন্তু গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী সরকারের এই প্রতিবাদটুকুও সহ্য হয়নি। তাই পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে হামলা করে নেতা-কর্মীদের আহত করলো, গ্রেফতার করলো ১১জন নেতা-কর্মীকে। এদিকে এই মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৫ মার্চ গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার জ্বালানি মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচিতেও পুলিশ টিয়ারশেল নিক্ষেপ ও হামলা করেছে। হামলায় আহত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা, অনিমেষ রায়, শরিফুল ইসলাম, সজীব চৌহান, খোকন মোহন্তসহ বিভিন্ন বামপন্থীদলের ১৬ জন নেতা-কর্মী। একদিকে কয়েকমাস আগে বিইআরসি'র গণশুনানিতে মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব অযৌক্তিক প্রমাণিত হলেও হঠাৎ করে স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা অন্যদিকে মূল্যবৃদ্ধির ফলে সংক্ষুব্ধ জনতার মনের আকুতিকে উচ্চকিত করছে যে প্রতিবাদী কণ্ঠগুলো তাদের উপর নির্মম দমন-পীড়ন – এই হল বর্তমান সরকারের গণতন্ত্রের নমুনা! একটা সরকার যদি গণতান্ত্রিক হয় তাহলে তো তার জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত। এই যে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি– এতে কি জনগণের সায় আছে? সমস্ত মহল থেকেই তো এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ এসেছে। তাহলে কেন এই মূল্যবৃদ্ধি? কার স্বার্থে?

২৮ ফেব্রুয়ারির হরতালে ছাত্র ফ্রন্ট কর্মী তমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ

আবাসিকে এক বার্নার চুলায় গ্যাসের দাম ৬০০টাকা থেকে বাড়িয়ে মার্চে ৭৫০ ও জুনে ৯০০টাকা এবং দুই বার্নার চুলায় গ্যাসের *(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা কি এদেশের জনগণ পাবে না?

'ভারত কর্তৃক একতরফা পানি প্রত্যাহার ও বাংলাদেশের কৃষির উপর প্রভাব শীর্ষক' মতবিনিময় সভা বাসদ(মার্কসবাদী) ও তিস্তা ও কৃষি বাঁচাও আন্দোলন' নীলফামারী জেলার উদ্যোগে ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১ টায় টাউন ক্লাব হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন তিস্তা ও কৃষি বাঁচাও আন্দোলনের সংগঠক অধ্যাপক তরিকুল ইসলাম। আলোচনা করেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, পানি বিশেষজ্ঞ ম. এনামুল হক, রিভারাইন পিপলের চেয়ারম্যান শেখ রোকন, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলাম, উদীচী জেলা সভাপতি মনসুর ফকির, যমুনা টিভির জেলা প্রতিনিধি

আতিয়ার রহমান, বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলার সদস্য আহসানুল আরেফিন তিতু প্রমুখ।

আলোচক বৃন্দ বলেন, সকল আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতি লংঘন করে ভারত কর্তৃক উজানে একতরফা পানি প্রত্যাহার করে (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

সার্চ কমিটি, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন-

গাছের গোড়া কেটে আগায় পানিবর্ষণ

দেশের চলমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কোন নতুন বিশ্লেষণের দাবি রাখে না। একটি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র যেমনভাবে পরিচালিত হওয়ার কথা, সম্পূর্ণ সেরকমভাবেই আমাদের দেশ পরিচালিত হচ্ছে। এরই মধ্যে কখনও কখনও কোন কোন বিষয় মানুষের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। একটা আলোচনা-তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। বিষয়ের গুরুত্বের দিক থেকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন এখন মানুষের রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে। আমরা বিগত বিভিন্ন সংখ্যায় এই সরকারের ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। আজ আমরা এই সময়ে রাজনৈতিক আলোচনায় প্রাধান্য নিয়ে থাকা আগামী নির্বাচন সম্পর্কিত আমাদের মূল্যায়ন তুলে ধরবো।

আরেকটি ৫ জানুয়ারিকে বাধা দেয়ার মতো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি এখনও তৈরি হয়নি

নির্বাচন নিয়ে এতো আলোচনা কেন? এ প্রশ্নটা আসা খুবই স্বাভাবিক। কারণ ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচন যাদের স্মরণে আছে এবং যারা তার পরবর্তী সময়ের সরকারবিরোধী আন্দোলনকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তারা কমবেশি নিশ্চয়ই এই মত ধারণ করেন যে, আরেকটি ৫ জানুয়ারির নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় যাওয়া আওয়ামী লীগের পক্ষে এখন কোন কঠিন বিষয় নয়। বিএনপি'র সাংগঠনিক অবস্থান খুবই দুর্বল। জনগণের দাবি নিয়ে রাস্তায় লড়াই করার সংগঠন সে নয়। জামায়াতও জনগণের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে লড়াই করার দল নয়। *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

গাছের গোড়া কেটে আগায় পানিবর্ষণ

(১ম পৃষ্ঠার পর) মানুষের সাম্প্রদায়িক চিন্তাকে উস্কানি দিয়ে, তাকে অন্ধ ও উগ্র করে দিয়ে ক্ষমতার রাজনীতিতে যতটুকু ভাগ বসানো যায় – সেটার চিন্তাই সবসময়ে সে করেছে।

এই সময়ে আওয়ামী লীগের শাসনে মানুষ বিক্ষুব্ধ, আবার ভারতের সমর্থন আওয়ামী লীগের পেছনে আছে – এটা মানুষের কাছে একেবারে স্পষ্ট। ফলে তীব্র ভারত বিরোধিতা অন্যান্য সময়ের চেয়ে এখন অনেক বেশি। এই ভারত বিরোধিতাটা ভারত নামক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের চরিত্র বুঝে তার শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বিরোধিতা যদি হতো – তবে এর একটা মানে থাকতো। সেটা সঠিকভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই গড়ে তুলতে পারতো। কিন্তু তা না হলে এই উগ্র ভারত বিরোধিতার মধ্যে একটি সাম্প্রদায়িক উপাদান থেকেই যায়। এই ক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক উপাদানটি তখন ভারতের শাসকগোষ্ঠীর সাথে সেই রাষ্ট্রের জনগণের পার্থক্য ভুলিয়ে দেয়। ভারতের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সে দেশের মেহনতি মানুষ লড়াই করছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দুটি দেশের সাধারণ মানুষ পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে যায়। এই সময় যেহেতু দেশের সরকার ও তাকে যারা সাহায্য করে তাদের বিরুদ্ধে মানুষের প্রবল ক্ষোভ ও রাগ আছে এবং সাধারণভাবেই এই সময় সচেতন না থাকলে গভীর যুক্তিবোধ ও বিচার-বিশ্লেষণাত্মক মনন ক্রিয়াশীল থাকে না, ফলে এর সুযোগ একটা গোষ্ঠী নেয়। আবার রাষ্ট্রের ফ্যাসিবাদী রূপ অর্থাৎ কোন মতকেই দাঁড়াতে না দেয়া, বলপ্রয়োগে সমালোচনা চাপা দেয়া ইত্যাদি বিষয় জনমানসেও প্রভাব ফেলে। একটা পাল্টা শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন জারি না থাকলে চাপা পড়া জনমানসে উগ্রতার উপাদান বৃদ্ধি পায়। যে কোন রক্ষণশীল শক্তির বৃদ্ধির জন্য এ পরিবেশ উপযোগী। জামায়াত সেই পরিবেশের সহযোগিতা কিছুটা পাচ্ছে।

উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে মানুষকে উস্কে দিয়ে, কিংবা পিলখানার ঘটনাকে সামনে এনে সেনাবাহিনীর সহানুভূতি আদায়ের প্রচেষ্টা করে– এককথায় বলতে গেলে কিছু এজিটেশনাল ট্যাকটিক্স প্রয়োগ করে ফ্যাসিবাদবিরোধী অভ্যুত্থান হয় না। এগুলো ক্ষমতায় আসার জন্য কিছু পরিকল্পিত ট্যাকটিক্যাল চালমাত্র। বুর্জোয়া রাজনীতিই দুনিয়াতে এসব আমদানি করেছে। মানুষ এর স্বরূপ বুঝতে না পেরে কখনও বিরাট সংখ্যায়ও এর শিকার হয়েছে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সত্যিকারের লড়াই করতে হলে মানুষকে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে ধারণা দিতে হয়। সেটা করতে গেলে তাকে বুর্জোয়া রাজনীতির অসারতাও ধরাতে হয়। বিএনপি-জামায়াত কারও পক্ষেই এটা সম্ভব নয়। কারণ তারা এবং আওয়ামী লীগ একই শ্রেণীর দল। দেশের পুঁজিপতি-শিল্পপতিরা আজ বিএনপি-জামায়াতকে চাইছে না, তাই এক সময়ে ক্ষমতার দণ্ড হাতে নিয়ে জনতাকে ঠেঙ্গিয়ে বেড়ানো এই দুই দল আজ কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না। তাদের লক্ষ লক্ষ নেতা-কর্মী, কোটি কোটি সমর্থক আজ যেন হাওয়াতে মিশে গেছে। এটা বুর্জোয়া রাজনীতি ছাড়া আর কোথাও দেখা যাবে না। আবার কখনও যদি বুর্জোয়াদের কাছে আওয়ামী লীগের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, এদেরকেই দরকার হয় – তবে মুহূর্তেই সমর্থনের বান ছুটে যাবে, দশদিক পূর্ণ করে লাখো-কোটি স্বরের জয়ধ্বনি তোপের মতো দাগবে, কাপড় বদলে, চেহারা পরিস্কার করে এই নেতারাই জনসমুদ্রের সেলাম নেবেন – এই তো বুর্জোয়া রাজনীতি! এই তো তার খেলা।

এ পরিস্থিতি ভাঙতে পারতো যদি বামপন্থী দলসমূহ এবং দেশের শিক্ষিত-সচেতন মানুষ, যারা বুর্জোয়া মানবতাবাদের শুরুর দিকের চিন্তাকে এখনও ধারণ করেন, তার বিকৃতি দেখে কষ্ট পান – সেই গণতন্ত্রমনা মানুষরা যদি একসাথে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারতেন। কিছু কিছু ব্যাপারে যতটুকুই আন্দোলন গড়ে উঠেছে যেমন রামপালে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনবিরোধী, গ্যাস-বিদ্যুৎ-নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদ ইত্যাদি ইস্যুতে, তাতে মানুষের সাড়াও অনেক ভালো। কিন্তু এখনও এই শক্তি দুর্বল।

এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে একতরফাভাবে যাই করুক, তাকে রুখে দেয়ার সম্ভাবনা যেহেতু ক্ষীণ, তাহলে আগামী নির্বাচন আবার আলোচনার বিষয়বস্তু কেন হলো? এই অবস্থার কোন পরিবর্তন হওয়ার কি কোন সম্ভাবনা ছিলো?

আমরা আন্তরিক - এই ভঙ্গিটি আনাই কি আসল উদ্দেশ্য?

সব রকমের গণতান্ত্রিক চেতনাকে পায়ে দলিত করেও গণতন্ত্রের নাটক সাজাতে হয় বুর্জোয়াদেরকে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এমনই এক সমাজব্যবস্থা যেখানে প্রতিদিন নতুন নতুন প্রতারণা না করে, জনগণকে না ঠকিয়ে সে টিকে থাকতে পারে না। এজন্যই দু'দিন পরপর নতুন শ্লোগান ওঠে। নতুন আশা তৈরি করা হয়। আবার আশাভঙ্গ হয়। তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চলে কিছুদিন। তারপর আসে নতুন নাটক। এ চলতেই থাকে যতদিন না জনগণ তা ধরতে পেরে এই ব্যবস্থাকে ভাঙ্গার লড়াই গড়ে তুলেছে। বুর্জোয়া মিডিয়াগুলো মানুষের মনন কাঠামো ও মতামত তৈরির ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম আছে এই মতামত তৈরির জন্য, তা হলো রাষ্ট্রের বেতনভুক্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়; এদের সাথে আপাত স্বাধীন, স্পষ্ট ভাষায় সত্য উচ্চারণ করা বুদ্ধিজীবীদের পার্থক্য আছে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পর বুর্জোয়া মিডিয়া ও মিডিয়াম্যানরা একটা হইচই তৈরি করলেন। এরকম নির্বাচনই দেশের মানুষ চায়, এ ধরনের রাজনৈতিক পরিবেশ দেশে থাকা দরকার, আওয়ামী লীগেরও শিক্ষা হলো যে উপযুক্ত প্রার্থী দিলে সেই জয়ী হবে – ইত্যাদি কথার ফুল ফুটতে শুরু করলো। অর্থাৎ দেশ এখন একটা স্থিতির দিকে যেতে চায়, আওয়ামী লীগ যা করেছে তা করেছে, এখন সে সবার অংশগ্রহণে নির্বাচন চায় – সেসময় গোটা ব্যাপারটা দেখতে লাগছিলো এমনই। এটাও মনে করা হচ্ছিলো যে, যেহেতু একা নির্বাচন করে জিতলেও এর মধ্যে জনগণের অনাস্থা থেকেই যায় এবং সেটা একসময় ফেটে পড়তে পারে, তাই বিষয়টিকে সহজ করার চেষ্টা আওয়ামী লীগ করছে।

একই সময়ে কর্মরত প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মেয়াদও শেষ হয়ে আসে। পরবর্তী নির্বাচন কমিশন গঠন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে সামনে আসে কারণ তাদের নেতৃত্বেই পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। রাষ্ট্রপতি তখন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা শুরু করেন সার্চ কমিটি গঠনের জন্য। কারণ সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন। তবে তিনি তা করবেন সুনির্দিষ্ট আইনের ভিত্তিতে। আইন সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় ২০১২ সালে যেমন সার্চ কমিটি করে কমিশন গঠন করা হয়েছিলো, এবারও তাই করা হয়েছে।

এবারের নতুন বৈশিষ্ট্য হলো সকল রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা। যেটা পূর্বে হয়নি। এতে সারাদেশে আলোচনা শুরু হয়ে যায়। রাষ্ট্রীয়ভাবে বিএনপিকে দীর্ঘদিন পর আলোচনায় ডাকাকে সরকারের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে পজেটিভ মনোভাব বলে আখ্যায়িত করা হয়, মিডিয়ায় মাতামাতি শুরু হয়ে যায় এবং জনগণের শিক্ষিত-সচেতন অংশ এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। ছয় সদস্যের সার্চ কমিটি ঘোষিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সরকারের মনোভাব অনেকখানি স্পষ্ট হলেও অনেকেই আশা ছাড়েননি, বিশেষ করে এই সার্চ কমিটি যখন দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের সাথে মত বিনিময় করে ও অনেকের মতামত নেয়।

সেই সার্চ কমিটির প্রস্তাবনা থেকে বাছাই করে রাষ্ট্রপতি নতুন নির্বাচন কমিশনারদের নাম ঘোষণা করেছেন। বলা বাহুল্য আওয়ামী লীগ ব্যতীত আর কোন দলই একে স্বাগত জানায়নি। এই নির্বাচন কমিশনই স্পষ্ট করেছে আগামী নির্বাচন কেমন হবে। অর্থাৎ আমরা আন্তরিক, সবাই আসুক আমরা চাই – মানুষকে এসবও দেখানো হলো, আবার চূড়ান্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকা মানুষকে কিছুদিন ব্যস্ত রাখাও গেলো। তাদের রাজনীতি পুরোটাই এখন একটা কৌশল, একটা মারপ্যাঁচের খেলা।

দেশের আইন-সংবিধান কি সুশাসনের জন্য,

না রাজনৈতিক প্যাঁচ কষার জন্য?

এই পরিস্থিতিতে আগামী নির্বাচনে বিএনপি যাবে কি'না সে প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিএনপি ও অন্যান্য দলের অংশগ্রহণ করা নিয়ে আলোচনা এখন চলছে, যদিও আওয়ামী লীগ যে আপেক্ষিক অর্থে নিরপেক্ষ নির্বাচনের কোন পরিবেশ রাখেনি সে ব্যাপারে সবাই একমত। বিএনপি কি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে? এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'বিএনপি যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তাহলে আইন অনুযায়ী তাদের নিবন্ধন বাতিল হয়ে যাবে। এই বোকামি নিশ্চয়ই বিএনপি করবে না।' তার এধরনের দ্বিধাহীন উক্তি শঙ্কার মধ্যে থাকা মানুষকে আরও শঙ্কিত করে। অর্থাৎ এমন একটা পরিবেশ তৈরি করা হলো, যেখানে একটা আপেক্ষিক নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রস্তুতির ব্যাপারে সবার যে মত নেয়া হলো, সেগুলোর গ্রহণ-বর্জন কোন প্রক্রিয়ায়, কি ভিত্তিতে হলো – তার কোন আলোচনাই নেই। আইনের প্যাঁচে ফেলে রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনে অংশগ্রহণে বাধ্য করে, সবাই অংশগ্রহণ করেছে দেশে-বিদেশে এই প্রচার করে, পারলে বিরোধীদের মধ্য থেকে কিছু লোক ভাঙিয়ে নিশ্চিত ক্ষমতাকে হস্তগত করাই এখন উদ্দেশ্য এবং তা প্রকাশ্য উদ্দেশ্য। গোপন নয়। এখন আর কোন রাখঢাকও নেই। তবে এই সময়ে বিএনপি'র ভাইস চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন নেতারা বলছেন যে, নিবন্ধন বাতিলের ভয়ে তারা প্রহসনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন – এমন হবে না।

এ সবই ঘটনা। এ বিষয়সমূহ বিবৃত করার মধ্যে আমাদের উদ্দেশ্য একটা জিনিস দেখানো। তা হলো এই যে, বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার নির্বাচনের আর কোন প্রয়োজন নেই। অনেক বড় কথা বলে বুর্জোয়া রাষ্ট্র পত্তনের শুরুতে নির্বাচন, পার্লামেন্ট ইত্যাদি তারা এনেছিলো বলে এখন রাতারাতি সবই গুটিয়ে নিতে পারছে না, কিন্তু তার অবস্থা যে কি দাঁড়িয়েছে তা দেশের মানুষ দেখতেই পারছেন। শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা বিশ্বের বুর্জোয়া রাজনীতিই আজ সংকটগ্রস্থ।

জনগণের ম্যান্ডেটকে আওয়ামী লীগের এতো ভয় কেনো?

সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন বলতে যা বোঝায় তা এ সময়কালে বিশ্বের কোথাও হয় না। কিছুদিন আগে আমেরিকার নির্বাচন মানুষ দেখেছে। তাতে জেফারসন, লিংকনের দেশের অবস্থা কি তা মানুষের সামনে পরিষ্কার হলো। এখন নিরপেক্ষ নির্বাচন মানে হলো জনগণ যাতে মোটামুটিভাবে ভোট দিতে পারে। কিন্তু ভোট পূর্ববর্তী ও চলাকালীন সময়ে টাকা, মিডিয়া, মাসল পাওয়ারের খেলা এখন স্বীকৃত ব্যাপার। বিভিন্ন দেশে এর ফর্ম বিভিন্ন কিন্তু কন্টেন্ট এক।

কিন্তু এইটুকু আপেক্ষিক নিরপেক্ষতা পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকার মানতে চাইছে না। কেন মানতে চাইছে না? জনগণের ম্যান্ডেটকে তাদের কিসের ভয়? তার মানে, ভীষণ ক্ষোভ মানুষের মধ্যে তৈরি হয়ে আছে, এতটুকু সুযোগ পেলেই তা ফেটে পড়বে। একটু পরিবেশ দিলে বিএনপি'র উপর ভরসা থেকে নয়, আওয়ামী লীগের উপর প্রবল ক্ষোভ থেকে পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারে।

কিন্তু এই ক্ষোভই কোন পরিবর্তন এনে দিতে পারে না। কারণ এতদিনের শাসনে তারা বিরোধী বুর্জোয়া দলগুলোর (যারা তাদের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে) সকল রকম সাংগঠনিক কাঠামোকে পর্যুদস্ত করেছে, পাশাপাশি উপর থেকে নিচ পর্যন্ত কায়েমি স্বার্থের এক বিশাল জাল বিস্তার করেছে। গরীব-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষের এক বিরাট অংশ এই চক্রে বন্দী। আবার শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের একটা অংশও সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের ভয়, উন্নয়নের বিভ্রান্তি ইত্যাদির কারণে এ সরকারের পরোক্ষ সমর্থক। একটা ক্ষোভ সঠিক রাজনৈতিক ভাষা না পেলে সঠিক পথে প্রকাশিত হতে পারে না। একটা লড়াই শুরু হলে বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে আত্মগ্লানিতে ভুগে গুটিয়ে থাকা বহু মানুষও রাস্তায় নামে। তাই বাম গণতান্ত্রিক শক্তি লড়াইয়ের বিকল্প হয়ে না ওঠা পর্যন্ত এটা ফেটে পড়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। আবার চূড়ান্ত দুঃশাসন রাষ্ট্রকে ভেতর থেকে চিড় ধরিয়ে দিলে জনগণের ক্ষোভ একটা সরকার পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু এই ব্যবস্থা থেকে বের হতে পারবে না।

মানুষের ভবিষ্যৎ কোথায়?

লড়াই ছাড়া মানুষের কোন ভবিষ্যৎ নেই। লড়াই না হলে মানুষের ভাগ্যে আছে বারবার সেই একই অত্যাচার-নিপীড়ন-নির্যাতন, পদে পদে অপমানিত হওয়া। আগামী নির্বাচন হবে কি হবে না, হলে কারা অংশগ্রহণ করবে, আপেক্ষিকভাবে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে কি'না – ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর এখন সময়ের অধিকারে। কিন্তু জনগণকে তাদের নিজস্ব সমস্যা-সংকটসমূহ নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলতে হবে – তবেই ফ্যাসিবাদের আক্রমণে ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন মানুষ যে অসহায়ত্ব বোধ করে, সেই পরিবেশ আর থাকবে না। সংগঠিত অবস্থানের শক্তি মানুষ টের পাবে। মানুষের সংগঠিত অবস্থানই এই নিপীড়ন-নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা কি এদেশের জনগণ পাবে না?

(১ম পৃষ্ঠার পর) বাংলাদেশের চতুর্থ বৃহত্তম নদী তিস্তাকে শুকিয়ে মারছে। তিস্তার পানি না পাওয়ায় প্রতিবছর ফসলহানীর কারণে সর্বশান্ত হচ্ছে কৃষক। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা সরকারি সহায়তা না পেয়ে মহাজনী ও এনজিও ঋণের দারস্থ হয়। এই ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে মধ্যচাষী জমিজমা বিক্রি করে গরীব ক্ষেতমজুর, দিনমজুরে পরিণত হয়। তিস্তার গজলডোবা বাঁধ একদিকে শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে মারে আবার বর্ষা মৌসুমে ডুবিয়ে মারে,ফসলী জমি বালু চরে পরিণত হয়। নদী ভাঙ্গনে সর্বশান্ত হয় মানুষ। আলোচক বৃন্দ আরো বলেন, আমাদের শাসকগোষ্ঠীর নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে স্বাধীনতার ৪৪ বছরেও তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় হয়নি বরং সকল সরকারই ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ভারতের স্বার্থে একের পর এক গণবিরোধী চুক্তি করেছে। শুধু তিস্তা নয় দু''দেশের অভিন্ন ৫৪টি নদীর ৫১ টি নদীতে আন্তর্জাতিক নদী আইন অম্যান্য করে ভারত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য উজানে অসংখ্য বাঁধ, ব্যারেজ দিয়ে এবং ভিন্নখাতে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করছে। ভারতের এই পানি আগ্রাসনের কারনে মরুকরণের ঝুঁকিতে গোটা বাংলাদেশ। ভারতের পানি আগ্রাসন ও সরকারের নতজানু নীতির বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণকে তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় ও ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ক্ষতিপুরণের দাবিতে নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান।

সোভিয়েত সমাজতন্ত্র নারীকে যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল

(এবছর মহান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষ। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নারীমুক্তির ক্ষেত্রে কি অবদান রেখেছিলো তা তুলে ধরা হয়েছে এ লেখায়)

রুশ বিপ্লব পৃথিবীর বুকে শোষণমুক্তির নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। সকল শোষিত মানুষ মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল। শোষিত মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শোষণের শিকার নারী। শোষিত নারীসমাজের বিকাশের রাস্তা অবাধ করেছিল সোভিয়েত সমাজতন্ত্র। সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ছিল বাধাহীন। আর যে দর্শনের ভিত্তিতে রাশিয়া এই অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছিল তার দার্শনিক ভিত্তি করেছিলেন মহামতি কার্ল মার্কস। মার্কসের আজীবন সহযোদ্ধা ছিলেন ফ্রেডরিক এঙ্গেলস। মার্কস-এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট ইশতেহারে' পুঁজিবাদ ও প্রাক পুঁজিবাদী সমাজে নারীর অধস্তন-নিপীড়িত-অপমানজনক অবস্থান এবং সমাজ গঠনের সঙ্গে নারীর অধস্তনতার সঙ্গে সম্পর্কিত বিধি-ব্যবস্থা, আইন-কানুনের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র দেখিয়ে যে সূত্রায়ন করেছিলেন তা নারীপ্রশ্ন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচিত করেছিল। ১৮৭৯ সালে অগাস্ট বেবেলের লেখা 'নারী ও সমাজতন্ত্র' গ্রন্থ এবং ১৮৮৪ সালে ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের 'পরিবার ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' গ্রন্থ সামগ্রিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও নারীমুক্ত আন্দোলনকে অবিচ্ছেদ্য হিসেবে দেখার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে।

রুশ বিপ্লব শিল্পে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর তুলনায় পশ্চাদপদ রাশিয়ায় নারীর আইনগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল যা তৎকালীন বিশ্বে ছিল অভাবনীয়। ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সামাজিকভাবে নারীর অগ্রযাত্রা হলেও সেই ফ্রান্সে ১৯৪৪ সালে নারীরা প্রথম পূর্ণ ভোটাধিকার লাভ করে। 'গণতন্ত্রের পীঠস্থান' বলে কথিত যুক্তরাজ্যে মেয়েরা ছেলেদের সমান বয়সে ভোটাধিকার লাভ করে ১৯২৮ সালে। ইতালিতে মেয়েরা ভোটাধিকার পায় ১৯৪৭ সালে। ১৯৭০ সালের পূর্ব পর্যন্ত ইতালিতে বিয়ে-বিচ্ছেদ আইনগত স্বীকৃতি পায়নি। নারী-পুরুষ সমান মজুরির বিধান পাশ হয় অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশগুলোতে ৬০ ও ৭০ এর দশকে। মাতৃত্বকালীন ছুটি, শিশুযত্নবিষয়ক সুবিধাদির ক্ষেত্রেও একথা আরো বেশি প্রযোজ্য [বারবারা, ১৯৮৩, ২০৫-২২১]। তবে রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের মহান নভেম্বর বিপ্লব তথাকথিত ঐ গণতান্ত্রিক বিশ্বকে দেখিয়েছিল কিভাবে সর্বক্ষেত্রে নারীর সমমর্যাদা-সমঅধিকার-সমঅংশগ্রহণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। একটি রাজনৈতিক পরিবর্তনই পারে সত্যিকার অর্থে নারীমুক্তি আনতে – রুশ বিপ্লব আমাদের সামনে সেই শিক্ষাই রেখে গেছে।

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার সামাজিক প্রেক্ষাপট ও নারীসমাজ

ইউরোপের সাথে সংযোগ থাকলেও রাশিয়া ছিল একটি পিছিয়ে পড়া দেশ। জমিদারি প্রথা আর জারতন্ত্রের শাসনে মধ্যযুগীয় পশ্চাৎপদতা, সামন্তীয় সংস্কৃতি বিস্তৃত ছিল গোটা দেশ জুড়ে। দেশের অধিকাংশ মানুষই ছিল কৃষিজীবী। ইউরোপের বহু দেশে যখন শিল্প বিপ্লব হয়েছে, তখন ১৮৬১ সালে রাশিয়া থেকে ভূমিদাস প্রথা বিলোপ হয়। ধীরে ধীরে শিল্প কারখানা গড়ে উঠে মূলত রাশিয়ার পশ্চিম অংশে। জারের অত্যাচারী শাসন ও তীব্র শোষণে দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। রাশিয়ার শাসকরা দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধবিগ্রহে অভ্যস্ত ছিল।

সামন্তীয় অর্থনীতির পরিপূরক সামন্তীয় সংস্কৃতির নিগড়ে বাঁধা ছিল রাশিয়ার সমাজ তথা পারিবারিক জীবন। পরিবারের কর্তা ছিলেন সর্বময় প্রধান। পরিবার পরিচালনায় নারীর কাজ ছিল মূলত নির্দেশ পালন করা। সারাদিন খেটেখুটে গৃহস্থালীর কাজ, সন্তান লালন-পালন করাই ছিল নারীদের কাজ। উচ্চবিত্ত ঘরের কিছু নারী খানিকটা স্বাধীনতা উপভোগ করলেও তা সীমাবদ্ধ ছিল মূলত আড্ডা, হৈহুল্লোড় বল-নাচের আসরে অংশগ্রহণের মধ্যে।

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় একটি কথা ছিল প্রবাদের মত-স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের মানতে বাধ্য। বিবাহিতা নারীদের কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্বকেই স্বীকার করা হত না। এমনকি একাকী বাড়ির বাইরে পা রাখলে পুলিশের চোখে সে অপরাধী গন্য হত এবং তাকে গ্রেফতার করা হত। দুশচরিত্র স্বামীক্রে ত্যাগ করার অধিকার নারীর ছিল না। অধিকাংশ নারী ছিল শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এমনকি কোনও নারীর নামে পাসপোর্ট পর্যন্ত ইস্যু হত না। শুধুমাত্র স্বামীর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্ত্রীর নাম উল্লেখ করা হত।

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় গণিকাবৃত্তি ছিল অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার, সে সময় মনে করা হত পুরুষের মঙ্গলের জন্য সমাজে গণিকাবৃত্তি টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন । তাই সমাজে নারীর এই ক্লেদাক্ত অবস্থানকে আইনসঙ্গত করা হয়েছিল। সরকারী আইনের দ্বারা একাজ পরিচালিত হত। গণিকা নারীদের কোনও নাগরিক অধিকার ছিল না। পাসপোর্টের পরিবর্তে তাদেরকে গ্রহণ করতে হত কুখ্যাত হলুদ কার্ড। কোন কারণে কেউ যদি একবার এই হলুদ কার্ড গ্রহণ করতে বাধ্য হত তাহলে সারা জীবন তাকে এই কলঙ্কময় জীবনের বোঝা বহন করতে হত। এর থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ ছিল না। জারের আমলে মাতৃত্ব ছিল বোঝা। মাতৃত্বের উপর চলতো সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়ন। তাই বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় গর্ভপাত করাতে গিয়ে বছরে প্রায় ২৫ হাজার নারীর মৃত্যু হয়। আর বিবাহকে ব্যবহার করে নারীকে দাসীতে পরিণত করা হত। সৃষ্টি করা হত পারিবারিক অসাম্য। সমাজের চোখে সে ছিল নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রাণী মাত্র।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পেট্রোগ্রাড, মস্কো প্রভৃতি পশ্চিমের শহরগুলোয় বহু কারখানা গড়ে উঠলে সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়। শিল্প-কারখানা গড়ে উঠার সাথে আবির্ভাব হয় শ্রমিকশ্রেণীর। জমি থেকে মুক্ত হয়ে দলে দলে শহরে আসে শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে। দশ-বারোঘন্টা করে কারখানায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে মদের আসরে আর ফূর্তির নাচে টাকা উড়িয়ে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ঘরে ফেরে তাদের এক বড় অংশ। নারীদের জীবন হয়ে উঠে আগের থেকে আরও কঠিন আর জটিল। অল্প আয়ের অধিকাংশই যখন মদের আসরে চলে যায়, তখন সংসার চালানোই হয়ে যায় আরো কঠিন। সেই কঠিন দায়িত্বটিই চাপে নারীর কাঁধে। সংসার চালাতে ধীরে ধীরে অনেক নারীই কারখানায় কাজ করতে শুরু করে। মূলত বস্ত্র বয়ন, খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ বা ঐ জাতীয় হাল্কা কাজের শিল্পেই তারা নিযুক্ত হয় বেশি সংখ্যায়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিভিন্ন কারখানায় এরকম অনেক নারীশ্রমিকেরই দেখা মেলে রাশিয়ায়। শিল্প কারখানায় নারীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় নারীশ্রমিকরা হয়ে পড়ে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সংখ্যায় কম মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের অবস্থাটা ছিল খানিকটা আলাদা। যেসব পরিবারের পুরুষেরা মূলত সরকারি দপ্তরে বা সৈন্যবিভাগে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করত বা ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল, সেইসব ঘরের মেয়েদের অনেকেরই পড়াশোনার সুযোগ ছিল। পড়াশোনা করে দেশ-বিদেশের জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেয়েছিল তারা। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণার সংস্পর্শে আসে তাদের অনেকে। রুশবিপ্লবে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বকারী অনেক বিপ্লবী নারীই এই ধরনের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘর থেকে এসেছিলেন।

বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্বে নারীদের ভূমিকা

রাশিয়ার জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম চরমপন্থী আন্দোলনের বিকাশ ঘটে নারদনিকদের মাধ্যমে। এরা ছিলেন নৈরাজ্যবাদী। বাকুনিন ছিলেন এদের নেতা। সোফিয়া পেরোভস্কায়া ছিলেন রাশিয়ার জারতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনের প্রথম নারী শহীদ। এরপর প্লেখানভের মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকে মার্কসবাদী আন্দোলনের সূচনা ঘটে। ১৮৮৩ সালে গঠিত হয় রাশিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সংগঠন 'শ্রমিক মুক্তি সংঘ'। এই সংগঠনের উল্লেখযোগ্য নারী বিপ্লবী ছিলেন ভেরা ইভানোভনা। 'শ্রমিক মুক্তি সংঘ' এর উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট মার্কসবাদী পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত পাঠচক্রে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও যোগ দিত। তাদের অধিকাংশই অল্পবয়সী। পেট্রোগ্রাড শহরে এরকম বেশ কিছু পাঠচক্র গড়ে উঠেছিল যার মাধ্যমে যুক্ত হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নারী। এদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ছিলেন আলেকজান্দ্রা কোলনতাই, নাদেজদা ক্রুপস্কায়া, এলেনা স্তাসোভা প্রমুখ।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতে নারীর অবস্থান

৩ নং প্রবাসীর পত্রে লেনিন বলেছিলেন,"আমরা যদি নারীদের জনহিতকর কাজে, মিলিশিয়ায়, রাজনৈতিক জীবনে টেনে না নামাই, আমরা যদি মেয়েদের গৃহকাজ ও ঘরকন্নার মারাত্মক আবহাওয়া থেকে টেনে না আনি, তাহলে সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব, এমন কি, গণতন্ত্র কায়েম করাও অসম্ভব, সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা।" তাই বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালে রুশ বিপ্লবী সরকার প্রথম যে পারিবারিক আইন ঘোষণা করেন তা ছিল তৎকালীন বিশ্বে সবচেয়ে অগ্রসর পারিবারিক আইন। নারীর সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে তৎকালীন কোনো ইউরোপীয় দেশে বিবাহ, বিয়ে-বিচ্ছেদ, গণিকাবৃত্তি সংক্রান্ত এ রকম কোনো আইন প্রণীত হয়নি। এরপর গর্ভপাত বৈধকরণ ও রোধ, জন্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ইত্যাদি আইনও রাশিয়ায় প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু এই আইন বাস্তবায়ন করা সহজ সাধ্য ছিল না। এর বাস্তবায়নের জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল।

এই পদক্ষেপের কারণে লক্ষ লক্ষ চাষী, শ্রমিক পরিবারের নারীরা স্বাধীন হয়েছিল। জমিদার, পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক শোষণ, স্বামী কিংবা পিতার প্রভুত্ব থেকেও নারী মুক্তি পেয়েছিল। সর্বক্ষেত্রে নারী, পুরুষের সাথে সমমর্যাদার অধিকারী হয়ে উঠেছিল। এক কথায় বলা যায় রুশ বিপ্লব নারীকে প্রথম প্রকৃত মানুষের মতো বাঁচতে শিখিয়েছিল। ১৮৬৬ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে মার্কস বলেছিলেন, 'পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম ব্যর্থ হবে যদি না নারীদের নানা অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করা যায়।' রাশিয়ায় বলশেভিক পার্টিও নারী স্বাধীনতাকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল, পুরুষের মতো নারীদের গড়ে তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল। অনুভব করেছিল মানবসভ্যতার পুনর্গঠনের জন্য প্রথম প্রয়োজন যথার্থ স্বাধীনতা। আর তাই লেনিন প্রথম থেকে পার্টির মধ্যে নারী সমিতি গড়ে তোলার উপর বেশি গুরুত্ব দেন।

সোভিয়েতের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্ক

সোভিয়েত নেতৃত্ব বুঝেছিলেন সুস্থ ও সবল জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন পরিবার ও বিবাহিত জীবনের নতুনবিন্যাস। সে কারণে বিপ্লবের কিছুদিন পর ১৯১৮ সালে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ 'জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু' এবং বিবাহ, পরিবার অভিভাবকত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আইনকানুন জারি করেছিল। তারপরেও ১৯৩৬ ও ১৯৪৪ সালে আরো কিছু ছোটখাট বিধান কার্যকর করেছিল। এই বিধানসমূহ গৃহিত হওয়ার পূর্বে সোভিয়েত সরকার সেগুলি সারা দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করেছিল এবং জনসাধারণের মতামত ও সংশোধনীগুলি বিচার করার পর তা সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয়েছিল।

সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ বিবাহের ক্ষেত্রে সকল অসাম্য দূর করার লক্ষে বিবাহ সম্পর্কিত নতুন আইন পাশ করেছিল। এটি ছিল সিভিল ম্যারেজ বা লৌকিক বিবাহ। দুইপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বিয়ে রেজিস্ট্রি হত এখানে তৃতীয় পক্ষের কোন প্রয়োজন হত না।

সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ছিল ব্যক্তির ইচ্ছানির্ভর। রাশিয়ার প্রখ্যাত আইনবিদ জেনিয়া বেলোশোভার ভাষ্য থেকে এই আইন কিরূপ ছিল তা বুঝা যায় – "মানুষের প্রতি মানুষের সব ধরণের অসাম্য ও নির্যাতন বন্ধ করাই ছিল অক্টোবর বিপ্লবের উদ্দেশ্য। স্বাভাবিকভাবেই পরিবারের মত মানব সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এই বিপ্লব হাত না দিয়ে পারেনি, ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে জারি হওয়া সোভিয়েত বিবাহ আইন, পরিবার সম্পর্কে নতুন বিধি প্রণয়ন করলো। তা হলো, পছন্দ করার স্বাধীন অধিকার এবং সোভিয়েত পরিবারের ভিত্তি হবে প্রীতি, পারিবারিক শ্রদ্ধা ও সমানাধিকার।"

একই সাথে সোভিয়েত সরকার বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও সব বাধানিষেধ দূর করল। ১৯১৭ সালের বিবাহ আইন অনুযায়ী - স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই যদি বিবাহ বাতিল করতে চায় তাহলে সেই বৈবাহিক সম্পর্ক বাতিল বলে গণ্য হবে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে নারী-পুরুষের মতামতের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেছিল। পারস্পারিক শ্রদ্ধা ভালোবাসার ভিত্তিতে যে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি তা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে সোভিয়েত আইন সহানুভূতির সাথেই সহযোগিতা করেছে। (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কমরেড স্ট্যালিনের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম মহান অথরিটি কমরেড স্ট্যালিনের ৬৪তম মৃত্যুবার্ষিকীতে বাসদ(মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির উদ্যোগে গত ৫ মার্চ বিকাল ৫টায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মানস নন্দী ও ফখরুদ্দিন কবির আতিক। সভার শুরুতে নেতৃবৃন্দ কমরেড স্ট্যালিনের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

সভায় কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, 'কমরেড স্ট্যালিন পার্টি, বিপ্লব ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি একাত্মতায় নিবেদিত জীবন সংগ্রামে অসাধারণ এক কমিউনিস্ট চরিত্র। বিপ্লবপূর্ব সময়ে পার্টি ও বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, দুনিয়ায় প্রথম শ্রমিক বিপ্লব সংঘটনে বিপ্লবের নেতা লেনিনের সহযোগীরূপে দৃঢ় সাহসী ভূমিকা পালনে ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধে তিনি শুধু শ্রমিক শ্রেণীরই নয় গোটা দুনিয়ার জনগণের একক নেতা হিসেবে ভূমিকা পালন করে হয়ে উঠেছিলেন মানব সভ্যতা রক্ষার কাণ্ডারী। তিনি ছিলেন দেশে দেশে উপনিবেশিক বিরোধী মুক্তি সংগ্রামে জনগণের ভরসাস্থল ও প্রেরণাদাতা।' তিনি বলেন, 'আজ যখন পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অপপ্রচারে ও শোধনবাদের ভ্রান্তবিচারে স্ট্যালিনের মহান চরিত্রের উপর কালিমা লেপনের জোয়ার চলছে, তখন এর সমুচিত জবাব দিয়ে সমাজতন্ত্রের গৌরবময় অধ্যায় তুলে ধরা কমিউনিস্টদের অন্যতম দায়িত্ব। এর মধ্য দিয়েই হবে এ মহান অথ রিটির শিক্ষার যথার্থ অনুসরণ।'

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সারাদেশে বিক্ষোভ

ঢাকা

গ্যাসের দাম বৃদ্ধির ঘোষণার প্রতিবাদে বাসদ (মার্কসবাদী) ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ২৪ ফেব্রুয়ারি বিকাল সাড়ে ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দলের মহানগর সংগঠক ফখরুদ্দিন কবির আতিকের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাইফুজ্জামান সাকন, বেলাল চৌধুরী, সীমা দত্ত প্রমুখ।

ফেনী

গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাসদ (মার্কসবাদী) ফেনী জেলা শাখার উদ্যোগে ২৮ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪ টায় ফেনী শহীদ মিনার চত্বরে এক মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) ফেনী জেলার সমন্বয়ক জসীম উদ্দিন, সদস্য বাদল চক্রবর্ত্তী, সমাবেশ পরিচালনা করেন মাসুদ রেজা। সমাবেশ শেষে একটি প্রতিবাদ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

চট্টগ্রাম

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক পানির মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ বিকাল ৪টায় বটতলী পুরাতন রেল স্টেশনে বাসদ(মার্কসবাদী) চট্টগ্রাম জেলার উদ্যোগে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ(মার্কসবাদী) চট্টগ্রাম জেলার সদস্য সচিব কমরেড অপু দাশ গুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শফিউদ্দীন কবির আবিদ, রফিকুল হাসান, জান্নাতুল ফেরদাউস পপি ও সত্যজিৎ বিশ্বাস। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে আন্দরকিল্লা মোড়ে এসে শেষ হয়।

সিলিন্ডার ব্যবসায়ীদের স্বার্থেই গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি

(১ম পৃষ্ঠার পর) দাম মার্চে ৬৫০ থেকে বাড়িয়ে মার্চে ৮৫০ টাকা ও জুনে ৯৫০ টাকা করা হলে ভোক্তা জনগণ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শুধু আবাসিকের গ্যাস নয়, শিল্প, সার, বিদ্যুৎ বাণিজ্যিক, চা-বাগান, সিএনজি প্রভৃতি খাতেও গ্যাসের মূল্য বাড়ানো হয়েছে। ফলে গ্যাসের উপর নির্ভরশীল উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সরাসরি বাড়বে। আবার উৎপাদিত পণ্য পরিবহনেরও খরচ বৃদ্ধির কারণে আরেকদফা পণ্যের মূল্য বাড়বে। পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিসহ বাড়ি ভাড়া, গাড়ি ভাড়া বৃদ্ধির ফলে সাধারণ জনগণ তথা নিম্ন-মধ্য আয়ের মানুষের জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে যাবে। অন্যদিকে প্রকৃত মজুরি না বাড়ায় এই সমস্ত সাধারণ মানুষের জীবনে নাভিশ্বাস উঠবে। ফলে এই কথা পরিষ্কার যে এই মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ জনগণের কোনো স্বার্থ নেই।

সরকারের তরফ থেকে যুক্তি করা হয় বেশি দাম দিয়ে কিনে কম দামে তাদেরকে গ্যাস বিক্রি করতে হয়। ফলে কতদিন আর ভর্তুকি দিয়ে চালাবে সরকার? এই যুক্তিও ধোপে টেকে না। কারণ গত কয়েক বছরে এইখাত থেকে সরকার লাভ করছে। পেট্রোবাংলার অধিভুক্ত কোম্পানিগুলো থেকে সরকার প্রায় ৬০০০ কোটি টাকা কর-লভ্যাংশ-রয়্যালটি বাবদ পেয়েছে গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে। এরপরও পেট্রোবাংলার নীট মুনাফা ১২৬৯ কোটি টাকার বেশি। রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য এই খাতে আরো নতুন করে শুল্কারোপ করছে। ফলে এই অবস্থায় গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। আবার যে গ্যাস সরকারকে কিনতে হয়, তাতে বেশি দাম দিতে হয় কেনো? পেট্রোবাংলা প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাস বাপেক্স-এর কাছ থেকে কেনে ২৫ টাকায়, আর বিদেশি কোম্পানির কাছ থেকে কেনে গড়ে ২৫০ টাকায়। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান থেকে যে গ্যাস ২৫ টাকা খরচ করে কেনা সম্ভব সেই গ্যাস তাহলে বেশি দাম দিয়ে কেনো বিদেশি কোম্পানি থেকে কিনতে হচ্ছে? বাপেক্সকে গ্যাসকূপ না দিয়ে বিদেশি কোম্পানিগুলোকে লিজ দিচ্ছে তো সরকারই। জনগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে বিদেশি কোম্পানিকে লিজ দিয়ে তাদের থেকে অতিরিক্ত দামে গ্যাস ক্রয় করে সরকার একবার জনগণকে ঠকাচ্ছে আবার সেই গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি করে আরেকবার জনগণের পকেট কাটছে।

অথচ জনগণকে ন্যায্য গ্যাসটুকুও দেওয়া হচ্ছে না। ঢাকা শহরে বেশিরভাগ এলাকায় বাসাবাড়িতে দীর্ঘদিন ধরেই গ্যাসের চাপ কম। ফলে রান্নার কাজে বিঘ্ন ঘটছে। তাই গ্যাসের চাপ না থাকায় পাইপলাইনের গ্যাসের উপর অতিষ্ঠ হয়ে সাধারণ মানুষ সিলিণ্ডারের দিকে ঝুঁকছে। প্রকৃতপক্ষে সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবসায়ীরাও এটা চায়। এদেশে ৪৮টি প্রতিষ্ঠান এই খাতের ব্যবসার সাথে যুক্ত। বাজারের নিয়ন্ত্রণ বসুন্ধরা গ্রুপের হাতে। প্রতিষ্ঠানগুলো মিলে 'এলপিজি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে। এর চেয়ারম্যানও বসুন্ধরা গ্রুপের কর্ণধার সালমান এফ রহমান। তিনি আবার প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারিখাত উন্নয়ন বিষয়ক উপদেষ্টাও বটে। ফলে একথা কারো বুঝতে বাকি থাকার কথা নয়, তিনি কি ধরনের উপদেশ দিচ্ছেন আর কি ধরনের উন্নয়ন করছেন! এই উন্নয়নের মূল কথা হলো সরকার সেবাখাত থেকে ভর্তুকি দিন দিন উঠিয়ে দিবে। ভর্তুকি উঠিয়ে দিয়ে বৈষম্য কমিয়ে সরকার সরকারিখাত আর বেসরকারিখাতের মধ্যে সমতা বিধান করবে। এই সমতা বিধানের অর্থ হলো সরকার সেবাখাতসমূহ সম্পূর্ণভাবে বাজারের উপর ছেড়ে দেবে। ব্যবসায়ীরা হিসাব কষে দেখেছে আগামী ৫/১০ বছরে বাংলাদেশে ২ মিলিয়ন মেট্রিকটন এলপিজি ব্যবহৃত হবে। বিশাল এই বাজার দেখে ব্যবসায়ীদের চোখ লোভে চকচক করছে। কিন্তু তাদের এই বাজার ধরার ক্ষেত্রে বাধা পাইপলাইনে গ্যাসের ব্যবহার। তাই পাইপলাইনের গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা কাটাতেই গ্যাসের কৃত্রিম সংকট ও মূল্যবৃদ্ধি করে এলপিজি'র বাজার তৈরি করা হচ্ছে। ফলে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় সরকারের এই সিদ্ধান্ত এলপিজি গ্যাসের ব্যবসায়ীদের স্বার্থই রক্ষা করবে। দুর্দশা বাড়বে জনজীবনে।

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

১০৭তম আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্র কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ৮ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে একটি র‍্যালি শুরু হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলন চত্বরে এসে সমাবেশে মিলিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন নারীমুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত, সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন, সহ-সভাপতি সুলতানা আক্তার রুবি, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিদীপা ভট্টাচার্য। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের শতবর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে মনীষীদের কোটেশন সম্বলিত আলোকচিত্র প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

সিলেট

চট্টগ্রাম

গাইবান্ধা

রংপুর

‘কেমন পাঠ্যপুস্তক চাই’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার মান আজ হুমকির মুখে। এ বছরের প্রথম দিনই সরকার পাঠ্যপুস্তক উৎসব করেছে। কিন্তু সেই পাঠ্যপুস্তকে নজিরবিহীন ভুল, সাম্প্রদায়িকীকরণ, লৈঙ্গিক বৈষম্য ও দলীয় প্রচারণার নির্লজ্জ বহিপ্রকাশ ঘটেছে। ক্ষমতাসীন ধনিক শ্রেণীর এই রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই সরকার সুপরিকল্পিত ভাবে মানুষের মানবিক চেতনা বিকাশের পথ রুদ্ধ করছে। পুঁজিবাদী শোষণ বলবৎ রাখার জন্যই পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তুর পরিবর্তন সহ শিক্ষাক্ষেত্রে নানামুখী আক্রমণ চলতেই থাকবে। বুদ্ধিজীবী মহলসহ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল নাগরিককে এই আক্রমণ ঠেকাবার লক্ষ্যে সচেতন ভূমিকা রাখতে হবে।

পাঠ্যপুস্তকে নজিরবিহীন ভুল, সাম্প্রদায়িকীকরণ, লৈঙ্গিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রা নগর শাখার উদ্যোগে ৪ মার্চ সকাল ১১ টায় নগরীর স্টুডিও থিয়েটারে ‘কেমন পাঠ্যপুস্তক চাই’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তাদের এমন মতামত উঠে এসেছে। মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন নগর শাখার সভাপতি তাজ নাহার রিপন। সভায় নগরের বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, শিক্ষক, প্রকৌশলী ও চিকিৎসকবৃন্দ আলোচ্য বিষয়ে তাঁদের মতামত তুলে ধরেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড: শিপ্রা দস্তিদার মুক্তিযুদ্ধ গবেষক ডঃ মাহফুজুর রহমান, নগর পরিকল্পনাবিদ প্রকৌশলী সুভাষ বড়ুয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আমির হোসেন, চট্টগ্রাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক নাঈম আবদুল্লাহ, ফতেয়াবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রভাষক শিলাব্রত দাশ, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুশান্ত বড়ুয়া, নোয়াপাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সাবেক শিক্ষিকা বিজয়লক্ষী দেবী, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক ফারিয়া হোসেন, মোহসেন আউলিয়া কলেজের প্রভাষক জোলায়খা আখতার, সাংস্কৃতিক সংগঠক ও অভিভাবক শাহীন মঞ্জুর এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি সত্যজিৎ বিশ্বাস মতবিনিময় সভায় আলোচনা করেন।

ছাত্র ফ্রন্টের নবীন বরণ ও সম্মেলন

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট গাইবান্ধা সরকারি কলেজ শাখার ১৩তম সম্মেলন ও নবীন বরণ ১৩ ফেব্রুয়ারি কলেজ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলেজ শাখার সভাপতি পরমানন্দ দাসের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম মিলনের সঞ্চালনায় সম্মেলন ও নবীব বরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ছাত্রনেতা সত্যজিৎ বিশ্বাস, জেলা শাখার সভাপতি শামীম আরা মিনা, সদস্য জুয়েল মিয়া এবং নবীন শিক্ষার্থী অর্থনীতি বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র আবু সায়েম শান্ত প্রমুখ। আলোচনা শেষে নবনির্বাচিত কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। এতে মাহবুব আলম মিলনকে সভাপতি এবং জুয়েল মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়।

আশুলিয়ায় শ্রমিক নির্যাতন বন্ধ ও ন্যূনতম মোট মজুরী ১৬ হাজার টাকার দাবিতে নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক সমাবেশ

আশুলিয়ায় শ্রমিক নির্যাতন বন্ধ ও ন্যূনতম মোট মজুরী ১৬ হাজার টাকা করার দাবিতে ৮ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টায় গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জ শহরের বিসিক এর সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের সমন্বয়ক জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শ্রমিক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা মাহবুবুর রহমান ইসমাইল, শহিদুল ইসলাম সবুজ ও তৌহিদুল ইসলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুন্দরবন মেলা ও নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ক্যাম্পাসের স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে সুন্দরবন মেলা ও নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলনের নানা তথ্য উপাত্ত, ফটোগ্রাফি ও চিত্রকর্মের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় এবং সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলনের প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ইভা মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সুন্দরবন মেলা ও নবীন বরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বাসদ (মার্কসবাদী)’র কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য সাইফুজ্জামান সাকন ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকা। আলোচনাসভা শেষে নবীন ছাত্রদের অংশগ্রহণে গান, কবিতা ও নাটক ‘সময়ের দাবি’ পরিবেশিত হয়।

মার্কস আবিষ্কার করেছিলেন মানব ইতিহাসের বিকাশের সূত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর) এবং ইতিহাস-বিজ্ঞান উভয়েরই অপূরণীয় ক্ষতি হল। এই মহান প্রাণের তিরোভাবে যে শূণ্যতার সৃষ্টি হল তা অচিরেই অনুভূত হবে ।

ডারউইন যেমন জৈব প্রকৃতির বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন তেমনি মার্কস আবিষ্কার করেছেন মানুষের ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম, মতাদর্শের অতি নিচে এতদিন লুকিয়ে রাখা এই সহজ সত্য যে, রাজনীতি, বিজ্ঞান, কলা, ধর্ম ইত্যাদি চর্চা করতে পারার আগে মানুষের প্রথম চাই খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, পরিচ্ছদ, সুতরাং প্রাণধারণের আশু বাস্তব উপকরণের উৎপাদন এবং সেই হেতু কোন নির্দিষ্ট জাতির বা নির্দিষ্ট যুগের অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রাই হল সেই ভিত্তি যার ওপর গড়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট জাতিটির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইনের ধ্যান-ধারণা, শিল্পকলা, এমনকি তাদের ধর্মীয় ভাবধারা পর্যন্ত এবং সেই দিক থেকেই এগুলির ব্যাখ্যা করতে হবে, এতদিন যা করা হয়েছে সেভাবে উল্টো দিক থেকে নয়।

কিন্তু শুধু এই নয়। বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির এবং এই পদ্ধতি যে বুর্জোয়া-সমাজ সৃষ্টি করেছে তার গতির বিশেষ নিয়মটিও মার্কস আবিষ্কার করেন। যে সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে এতদিন পর্যন্ত সব বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও সমাজতন্ত্রী সমালোচক উভয়েরই অনুসন্ধান অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল, তার ওপর সহসা আলোকপাত হল উদ্বৃত্ত মূল্য আবিষ্কারের ফলে।

একজনের জীবদ্দশার পক্ষে এরকম দুটো আবিষ্কারই যথেষ্ট। এমনকি এরকম একটা আবিষ্কার করতে পারার সৌভাগ্য যাঁর হয়েছে তিনিও ধন্য। কিন্তু মার্কসের চর্চার প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং তিনি চর্চা করেছিলেন বহু বিষয় নিয়ে এবং কোনোটাই ওপর ওপর নয়, তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই, এমনকি গণিতশাস্ত্রেও তিনি স্বাধীন আবিষ্কার করে গেছেন।

এই হল বিজ্ঞানী মানুষটির রূপরেখা। কিন্তু এটি তাঁর ব্যক্তিত্বের অর্ধেকও নয়। মার্কসের কাছে বিজ্ঞান ছিল এক ঐতিহাসিকভাবে গতিষ্ণু বিপ্লবী শক্তি। কোন একটা তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের যে আবিষ্কার কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের কল্পনা করাও হয়তো তখন পর্যন্ত অসম্ভব, তেমন আবিষ্কারকে মার্কস যত আনন্দেই স্বাগত জানান না কেন, তিনি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের আনন্দ পেতেন যখন কোনো আবিষ্কার শিল্পে এবং সাধারণভাবে ঐতিহাসিক বিকাশে একটা আশু বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করছে। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎশক্তির ক্ষেত্রে যেসব আবিষ্কার হয়েছে তার বিকাশ এবং সম্প্রতি মার্সেল দেপ্রের আবিষ্কারগুলি তিনি খুব মন দিয়ে লক্ষ করতেন।

কারণ মার্কস সবার আগে ছিলেন বিপ্লববাদী। তাঁর জীবনের আসল ব্রত ছিল পুঁজিবাদী সমাজ এবং এই সমাজ যেসব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে তার উচ্ছেদে কোনো না কোনো উপায়ে অংশ নেওয়া, আধুনিক প্রলেতারিয়েতের মুক্তিসাধনের কাজে অংশ নেওয়া, একে তিনিই প্রথম তার নিজের অবস্থা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে, তার মুক্তির শর্তাবলী সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিলেন। তাঁর ধাতটাই ছিল সংগ্রামের। এবং যে আবেগ, যে অধ্যবসায় ও যতখানি সাফল্যের সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করতেন তার তুলনা মেলা ভার। প্রথম Rheinische Zeitung (1842), c¨vwi‡mi Vorwarts (1844), Deutsche Brusseler Zeitung (1847), Neue Rheinische Zeitung (1848-’49), New York Tribune (1852-’61) পত্রিকা এবং এছাড়া একরাশ সংগ্রামী পুস্তিকা, প্যারিস, ব্রাসেলস্ এবং লন্ডনের সংগঠনে তাঁর কাজ এবং শেষে, সর্বোপরি মহান শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি গঠন এটা এমন এক কীর্তি যে আর কোনো কিছু না করলেও শুধু এইটুকুর জন্যই এর প্রতিষ্ঠাতা খুবই গর্ববোধ করতে পারতেন।

এবং তাই, তাঁর কালের লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রোশ ও কুৎসার পাত্র হয়েছেন মার্কস। স্বেচ্ছাতন্ত্রী এবং প্রজাতন্ত্রী- দু’ধরনের সরকারই নিজ নিজ এলাকা থেকে তাঁকে নির্বাসিত করেছে। রক্ষণশীল বা উগ্র-গণতান্ত্রিক সব বুর্জোয়ারাই পাল্লা দিয়ে তাঁর দুর্নাম রটনা করেছে। এ সবকিছুই তিনি ঠিক মাকড়শার ঝুলের মতোই ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন, উপেক্ষা করেছেন এবং যখন একান্ত প্রয়োজনবশে বাধ্য হয়েছেন একমাত্র তখনই এর জবাব দিয়েছেন। আর আজ সাইবেরিয়ার খনি থেকে কালিফোর্নিয়া পর্যন্ত, ইউরোপ ও আমেরিকার সব অংশে লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী সহকর্মীদের প্রীতির মধ্যে, শ্রদ্ধার মধ্যে, শোকের মধ্যে তাঁর মৃত্যু। আমি সাহস করে বলতে পারি যে মার্কসের বহু বিরোধী থাকতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত শত্রু তাঁর মেলা ভার।

যুগে যুগে অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর নাম, অক্ষয় থাকবে তাঁর কাজ।

সমাজতন্ত্র নারীকে যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সোভিয়েতের দৃষ্টিতে গর্ভপাত

গর্ভপাত – একটি সামাজিক অপরাধ ও অনৈতিক বলে বিচেচ্য ছিল। সোভিয়েত সমাজও এটিকে অপরাধ মনে করত। কিন্তু কেন সোভিয়েত সমাজতন্ত্র এই অভিনব আইনটি করেছিল! গর্ভপাত বন্ধে আইন করে কোন দেশই এই অপরাধকে বন্ধ করতে পারেনি। বরং তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা প্রথম অনুধাবন করলেন আইন করে এই সমস্যা দূর করা যাবে না। এর বীজ নিহিত আছে অর্থনৈতিক ও নৈতিক সমস্যার গভীরে। তাই এই অপরাধকে সমূলে উৎপাট করার লক্ষ্যে সাময়িকভাবে এই আইন করেছিল। সোভিয়েতে গর্ভপাতকে আইনসিদ্ধ করে কিছু বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেল গর্ভবতী নারী শারীরিকভাবে অসমর্থ হয়ে পড়ায় কাজ হারানোর ভয়ে গর্ভপাত করত । ফলে স্বামী-সন্তানসহ গোটা পরিবারে একটা সংকটে পড়ত। গর্ভাবস্থায় অর্থনৈতিক সংকটের কারণেই ভবিষ্যৎ সন্তানের যত্ন নেয়া দুঃসাধ্য মনে করেই অনেক নারী গর্ভপাত করতে বাধ্য হত। কিন্তু সোভিয়েত সরকার এই অবস্থা থেকে মেয়েদের মুক্তি দিয়েছিল। দিয়েছিল কাজের নিশ্চয়তা। ২০ বছর পরে সোভিয়েত সরকার আইনি গর্ভপাতকে বাতিল করে দিয়েছিল। গর্ভপাতের সমস্যা দূর করতে রাষ্ট্র মাতৃত্বের গৌরব প্রতিষ্ঠা করল। ফলে ১৯৪৪ সালে রাশিয়া হল গর্ভপাত মুক্ত।

সোভিয়েতের চোখে মাতৃত্ব

সোভিয়েত রাষ্ট্রে মাতৃত্ব ছিল গৌরবের। এই গৌরবকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। এই পদক্ষেপগুলি হলো গর্ভকালীন অবস্থায় সব নারীই নিশ্চিত চিকিৎসা সেবা পেত। ভবিষ্যৎ মায়ের জন্য ৬-১২ সপ্তাহ ছুটি বরাদ্দ করা হয়েছিল। কর্মক্ষেত্রেই গড়ে উঠেছিল নার্সারি, সেখানে নবজাত সন্তানের জন্য ২ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে সন্তান প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যাতে কর্মক্ষেত্রে কোন মা অসুবিধায় না পড়ে। প্রতি সাড়ে ৩ ঘন্টা অন্তর শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য মায়েদের কর্মস্থল থেকে ছুটি দেয়া হত। অর্থাৎ শিশুর লালন-পালনের জন্য রাষ্ট্র সব দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। আর আইন করে এইসব ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হল। এইসব ব্যবস্থার ফলে একজন নারী মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হল, পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে একজন শ্রমজীবী নাগরিক হিসেবে তার মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানও রক্ষা পেত।

বিপ্লবের কয়েক বছর আগেও রাশিয়ায় গর্ভবতী নারী ও শিশু মৃত্যুতে প্রথম সারিতে ছিল। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে সেখানে মা ও শিশু মৃত্যুর হার সবচেয়ে কমে গেল। নতুন আইনের প্রণয়নের পরে সোভিয়েত মায়েরা ৩৪ লক্ষ ডলার আর্থিক অনুদান পেয়েছিল। রাষ্ট্র সমস্ত গর্ভবতী নারীকে নিয়মিত বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিসেবা দিত। সোভিয়েতের সমস্ত শহর জুড়েই ছিল মাতৃত্বকালীন হাসপাতাল, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

ব্রিটিশ ও আমেরিকার একটি রিপোর্ট এইসব উৎকর্ষতাকে স্বীকার করেছিল। স্যার অর্থার নিউজ হোলম্‌স এবং ডঃ জে এ কিংসবারি ১৯৩৩ সালের এক সমীক্ষায় স্বীকার করেন- "সোভিয়েত মায়েদের এবং সন্তানদের চিকিৎসা, স্বাস্থ্যজনিত সেবা, উন্নত কর্মপদ্ধতি, বিজ্ঞা ভিত্তিক কাজ, অর্থনৈতিক সুবিধাপ্রদান আমাদের বিস্মিত করেছে, মাতৃত্ব এবং শিশু পরিচর্যার প্রতিষ্ঠান এবং তাদের কাজকর্মের প্রভাব আর কোথাও এমন হয় কিনা সন্দেহ।"

গণিকাবৃত্তি ও সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গি

পুঁজিবাদ গণিকাবৃত্তির দায় নারীর উপর চাপিয়ে দেয়। ফলে সকল ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করে নারীর জন্য। কিন্তু কেন একজন নারী এই বৃত্তি গ্রহণ করে তার কারণ অনুসন্ধান করে না। এই গণিকা বৃত্তি প্রশ্নে সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। "রাশিয়ার মানুষকে ভেঙেচুরে নতুন করে তৈরি করতে গিয়ে লেনিন ও তাঁর অনুগামীরা শুরু করলেন নারীকে দিয়ে, পুরুষকে দিয়ে নয়।---- শুধু নারীদের জন্যই সেখানে নারীমুক্তির কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নে নারীমুক্তির কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য।"

বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যতদিন নরনারীর মধ্যে অসাম্য থাকবে ততদিন মানবজাতির পূনর্গঠন অসম্ভব। ব্যভিচার ও গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের শুরুতেই তাঁরা ঘোষণা করলেন, মানবজাতি অবিভাজ্য।

১৯২৩ সাল থেকে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এই গণিকাবৃত্তি বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করলেন। প্রথম আঘাত একটা সোরগোল ফেলে দিল। এই ধরণের চেষ্টা কখনও হয়নি। একটা প্রশ্নপত্র ছাপানো হল এবং তা গোপনে হাজার হাজার নারীর মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হল। প্রশ্নপত্র তৈরি করেছিলেন নারী-পুরুষ ডাক্তার, মনোবিদ, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা।

নারী কেন এই জীবন গ্রহণে বাধ্য হয় সে প্রসঙ্গে এই হল প্রথম গণনিরীক্ষা। -- কয়েকজনকে প্রশ্ন করে নয়, সিদ্ধান্ত করা হয়েছে নানা সামাজিক স্তরের, বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য নারীকে সোজাসুজি প্রশ্ন করে। সমস্ত জবাব ছিল লিখিত এবং জমা দেওয়া হয়েছিল চূড়ান্ত গোপনীয়তার মধ্যে।

সেই অভূতপূর্ব প্রশ্নগুলো বহু যুগ সঞ্চিত বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে আঘাত দিয়েছিল। সোভিয়েত অনুসন্ধানকারীদের যা অবাক করল, তা হল প্রায় প্রতিটি জবাবের খোলাখুলি ভাব। কারণ, ওঁরা নিশ্চিত ছিল, জবাব গোপন থাকবে।

এই নিরীক্ষা থেকে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল, সাধারণ মানুষের কাছে তার বিস্ময়কর দিক হল- পেশাদার গণিকা ও সাধারণ নারীর মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোন বিভেদ রেখা বাস্তবে নেই।...যারা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তাদের মধ্যে একটা বড় অংশই বলেছেন যে, পরিবারের সামান্য আয়ে জীবন ধারণ অসম্ভব। তাই পরিবার ও সন্তান সন্ততিদের বাঁচানোর জন্য এই পথ গ্রহণে তাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন।

জীবন ধারণের জন্য নারী কেন গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করে? সোভিয়েত প্রশ্নাবলীর যে উত্তর পাওয়া গেল তা প্রায় সর্বসম্মত দারিদ্রের চাপে, অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে মেয়েরা এই জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সোভিয়েত নারীরা জোরের সাথে আর একটা উত্তর লিখলেন। এই পথে তাঁরা পা দিয়েছেন কারও না কারও প্ররোচনাতেই। প্ররোচনা দিয়েছে সেই নারী বা পুরুষ যারা গণিকাবৃত্তিকে মুনাফা অর্জনের কাজে ব্যবহার করছে অর্থাৎ গণিকালয়ের পরিচালকেরা। প্রশ্নোত্তর পত্রে অধিকাংশ মেয়েই বলেছিল, যদি মর্যাদাপূর্ণ কাজ পাওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনাও থাকে তবে তাঁরা তাঁদের জীবনকে নতুনভাবে তৈরি করার চেষ্টা করবে।

এই গণিকাবৃত্তি রোধে সোভিয়েত সরকার ধাপে ধাপে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ১৯২৫ সালে "গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের কর্মসূচী" এই শিরোনামে আদেশ জারী হল। এই ধাপে সমস্ত নারীদের জন্য কাজের নিশ্চয়তা, স্কুল ও ট্রেনিং সেন্টারগুলিতে মেয়েদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা, আবাসনের ব্যবস্থা করা, গৃহহীন নারী ও শিশুদের নিরাপত্তার জন্য সব ধরণের ব্যবস্থা করা ও সচেতনতামূলক কমসূচি বাস্তবায়নের জন্য সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান, ট্রেডইউনিয়ন, কো-অপারেটিভ, গণসংগঠনকে আহ্বান জানান হল।

এরপর সোভিয়েত সরকার একটি বিস্ময়কর ডিক্রী জারী করল। এরপর যখনই কোন অফিসার বাড়ী, পানশালা বা অন্ধকার রাস্তায় পতিতাদের খোঁজে অভিযান চালাত, তখন উপস্থিত সমস্ত পুরুষদের নাম, ঠিকানা ও কোথায় সে কাজ করে ইত্যাদি লিখে নিতে হতো। খদ্দেরকে গ্রেফতার করা হত না। কিন্তু পরদিন, একটা জনবহুল এলাকায় তাদের নাম-ধাম পরিচয় জানিয়ে বড় বড় অক্ষরে লিখে দেওয়া হত - "নারী দেহের ক্রেতা"। আর এটা লেখা থাকত বেশ কয়েকদিন ধরে। কারখানার বুলেটিন বোর্ডে বড় বড় আবাসনের গায়ে নামের তালিকা চোখে পড়ার মত করে টাঙানো থাকত। আর নাটকের মাধ্যমে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতেও সরকার উদ্যোগ নিয়েছিল।

সোভিয়েত ডিক্রী এই শক্তিশালী গোপন সামাজিক বিবেককে গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে বিধ্বংসী অস্ত্রে পরিণত করল। এক ধাক্কায় ব্যক্তি বিবেক গণনিরাপত্তার হাতিয়ারে পরিণত হল।... বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই ব্যবস্থায় নৈতিকতার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না, কোন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না। এর পরিবর্তে বলা হল, নতুন এই রাষ্ট্র গণিকাবৃত্তিকে অনৈতিক মনে করে - কারণ, এর ফলে মানুষ ঘৃণ্যতম শোষণের শিকার হয়। ১৯২৬ সাল থেকে যৌনরোগ বিরোধী সোভিয়েত অভিযান কিন্তু কার্যকরভাবে সংগঠিত হয়েছে। ১৯৩১ সালের শেষ দিকে এই পরিকল্পনা এতটাই সফল হল যে, রোগীর অভাবে বহু ক্লিনিক বন্ধ করে দিতে হল। ১৯৩৮ সালে লালফৌজ ও নৌবাহিনী সিফিলিস ও গণরিয়া মুক্ত হল। নাগরিক জীবনে এই রোগের খুব একটা গুরুত্ব রইল না। বাস্তবে গণিকাবৃত্তি চিরতরে অদৃশ্য হল।

কর্মময় জীবনে সোভিয়েত নারীর অগ্রগতি

প্রথম দিকে নারী শ্রমিকদের অর্ধেকের বেশি ছিল নিরক্ষর। কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছরেই ১৯৩০ সালে তা কমে গেল আশাতীতভাবে। ১০০ জনের মধ্যে ৮৪.২ ভাগ মেয়ে লেখাপড়ায় পারদর্শী হয়ে উঠল। দলে দলে বিভিন্ন শিল্প-শিক্ষালয়ে গিয়ে ভর্তি হলো তারা। সাধারণ শ্রমিক হয়ে থাকলে চলবে না। দেশের খাতিরে, তাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিল্প-শিক্ষায় সুদক্ষ হয়ে উঠতে হবে। ফলস্বরূপ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দিনগুলিতে দেখা গেল লক্ষ লক্ষ নারী কলকারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের নানা ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রত। ১৯৩৭ সালের হিসাব থেকে দেখা যায় যে ৯৪ লক্ষ নারী সোভিয়েট দেশের নানা কাজে-কর্মে নিযুক্ত আছে। ১৯৩৫ সালের একটি হিসাবে মেয়েদের কাজের সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়। বড় বড় কলকারখানায় নারীর সংখ্যা ২৬ লক্ষ ২৭ হাজার, নির্মাণকাজে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার, যানবহনে ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার, বাণিজ্য ও সাধারণ ভোজনাগারে ৮ লক্ষ ২২ হাজার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাষ্ট্রপরিচালনায় ১৯ লক্ষ ৭৮ হাজার এবং কৃষিকাজে ৬ লক্ষ ৮৫ হাজার নারী নিযুক্ত ছিল।

১৯৩৩-৩৪ সালে মেয়েরা মাঠে মাঠে ট্রাক্টর, কমবাইন চালাতে শুরু করেছে। এমনকি ১৯৩৪ সালে একদল মেয়ে ট্রাক্টর – চালক একদল পুরুষদেরকে কাজে হারিয়ে দেয় এবং পরে সেই পুরুষরা মেয়েদের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করে। ১৯৩৫ সালে কম্‌বাইন পিছু ৪০০-৪৫০ একর জমি চাষ করা যেত। সে জায়গায় আমেরিকায় একজন চাষী ৫৫৭.৫ একর জমি তৈরি করতে পারত। ১৯৩৫ সালেই সোভিয়েতের বীর মেয়েরা আমেরিকার রেকর্ড ভঙ্গ করে ১৩৬০ একর জমি প্রস্তুতি করেছে।

১৯৩৮ সালের একটা হিসাব থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় সোভিয়েত সমাজে মেয়েরা কত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে- বড় বড় শ্রমশিল্পে ৩৯.৮% নারী, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ৩৪%, বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৩.১, চিকিৎসা-শাস্ত্রে ৫০.৬% , শিক্ষাজগতে ৬৪.৮%। পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম নারী রাষ্ট্রদূত হলেন একজন রুশ নারী, ম্যাদাম কোলনতাই। সর্বোচ্চ শাসন পরিষদের সভাপতির মধ্যে দুজন হলেন সভানেত্রী। ১৯৪০ সালের তথ্য থেকে জানা যায়, সে সময়ে যৌথ খামারের সভানেত্রী-সহসভানেত্রীর সংখ্যা হল ১৪ হাজার ২শত এবং খামারের প্রাণীপালন বিভাগের প্রধান পরিচালিকার সংখ্যা হলো ৪০ হাজার।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতায় সোভিয়েত নারী

জারের আমলে ৭০% লোক এক অক্ষর লিখতে পড়তে জানত না। গ্রামের কৃষক মেয়ে ও কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষার অবস্থা ছিল আরো করুণ। ১৯২০ সালে মোট জনসংখ্যার ৬৭% ছিল অশিক্ষিত। মেয়েদের ক্ষেত্রে ছিল ৭৫% । ১৯২৯ সালে ৫৮% মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠেছিল। ১৯৩২ সালের মধ্যে ৯০% মানুষ অক্ষর চিনতে শিখল, নিজের মাতৃভাষাকে ভালবাসতে শিখল। মাত্র ১২ বছরের মধ্যে অশিক্ষিত জনসংখ্যার ৬০% কে শিক্ষিত করে তোলা হল যা ছিল বিস্ময়কর।

শিশু-শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি শিল্পাঞ্চলে, যৌথখামারে, শহরে জনসংখ্যার প্রয়োজন অনুসারে হাজার হাজার ক্লাব গড়ে তোলা হয়েছে। কোথাও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোথাও শ্রমিক সংঘ ক্লাব, অবার কোথাও যৌথ খামার ক্লাব। একই সাথে সজ্জিত পাঠাগার ছিল। এখানে এসে সকলে মনোযোগের সঙ্গে পড়াশোনা করত। নিজেদের দেশের নান খবর, দেশ-বিদেশের খবর, জ্ঞানবিজ্ঞানের খবর আহরণ করে পারস্পরিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করত। একই সাথে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হত। এই চক্রগুলি সোভিয়েত সংস্কৃতির জগতে গুরুত্বপূণৃ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৩৩ সালের হিসাব থেকে দেখা যায় মোট চক্র সভ্য ছিল ২১ লক্ষ ৭৯ হাজার, তার মধ্যে মেয়েরা ছিল ৯৭ হাজার। এ তথ্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে সৃজনীশক্তি, কল্পনাশক্তি ও বৃদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে চক্রের মেয়েরা পুরুষদের প্রায় সমান সমান ছিল।

উল্লেখিত কর্মসূচি নারীকে নতুন জীবন দিয়েছিল। দুনিয়ার সামনে নারীসমাজ ও নারী আন্দোলন নতুনভাবে গড়ে উঠেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের মেয়েরা সবচেয়ে বেশি অধিকারসম্পন্ন শিক্ষিত সুস্থ মানুষ হিসেবে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত মুসলিম প্রজাতন্ত্রের মেয়েরা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মধ্যে বৈষয়িক ও মানসিক উভয় দিক থেকে সবচেয়ে স্বাধীন ও অগ্রসর নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। [আইজাজ, ১৯৯৩]

তথ্যসূত্র:

১. জীবনের সন্ধানে: ডাইসন কার্টার ২. মেয়েদের অধিকার-কল্যাণী রায়, পথিকৃৎ, বিশেষ শারদ সংখ্যা অক্টোবর ২০০০ ৩. শতবর্ষে নভেম্বর বিপ্লব: সাংস্কৃতিক ত্রৈমাসিক, প্রমিথিউসের পথে, আগস্ট-অক্টোবর ২০১৬ ৪. নারীমুক্তির প্রশ্নে: মার্কস-এঙ্গেলেস- লেনিন-স্তালিন: অনুবাদ-কনক মুখোপাধ্যায় ৫. নারী, পুরুষ ও সমাজ: আনু মুহাম্মদ

ট্রাম্প যুগের রাজনীতি

(শেষ পৃষ্টার পর) রাজনৈতিক মহলের একাংশ থেকে বিরোধিতার সম্মুখিন হচ্ছে। এরা রাশিয়ার কাছে মার্কিন জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেয়ার অভিযোগ তুলছেন ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে। ইতোমধ্যে রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের সাথে আঁতাতের অভিযোগে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন ট্রাম্পের উপদেষ্টা মাইকেল ফ্লিন।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা পদক্ষেপে স্পষ্ট যে, ইরান এবং মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু দেশের সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসন বৈরিতার পথই বেছে নিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কংগ্রেসে যে বাজেট প্রস্তাব পাঠাবেন, তাতে প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়বে ১০ শতাংশ, কমপক্ষে ৫৪ বিলিয়ন ডলার। অথচ এখনি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাজেট ৫৯৬ বিলিয়ন ডলার, যা পরবর্তী সাতটি দেশ চীন, সৌদি আরব, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ভারত, ফ্রান্স ও জাপানের সম্মিলিত ব্যয় ৫৬৭ বিলিয়নের চেয়ে বেশি। ফলে, কূটনীতির চেয়ে শক্তি প্রদর্শনই এই প্রশাসনের নীতি বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

সংক্ষিপ্ত অভিষেক বক্তৃতায় ট্রাম্প বলেছেন, তাঁর নীতি হচ্ছে 'আমেরিকা ফার্স্ট'। তিনি মার্কিন জনগণের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে কাজের সুযোগ কমে যাওয়ার কথা বলেছেন। পাশাপাশি শিক্ষার ব্যয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও মানের অবনতি, অপরাধ-অপরাধী চক্র ও মাদকের প্রসারের উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই বক্তব্যে সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির সংকটগ্রস্ত চেহারা ফুটে উঠেছে। সংকটজনিত অনিশ্চয়তার পাশাপাশি বিপুল বৈষম্য, ধনিকগোষ্ঠীর সম্পদ বৃদ্ধি মানুষকে প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। ১% বনাম ৯৯% শ্লোগান নিয়ে ২০০৮ সালের ওয়াল স্ট্রীট আন্দোলনের কথা নিশ্চয় অনেকের মনে আছে। বৈষম্য ও অর্থনৈতিক দুর্দশার বিরুদ্ধে নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর বিক্ষোভকে সুকৌশলে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে ট্রাম্প অভিবাসী বিরোধী শ্লোগান নিয়ে এসেছেন। 'অভিবাসীরাই সব সংকটের জন্য দায়ী, তারা মার্কিনীদের সম্পদ ও চাকরির বাজারে ভাগ বসাচ্ছে' – এমন প্রচারণা চলছে। অথচ অভিবাসীরাই আমেরিকা গড়ে তুলেছে, মার্কিন দেশের সমৃদ্ধিতে তাদের অবদান বিরাট। অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান হিসেবে ট্রাম্প সীমান্ত সুরক্ষা অর্থাৎ দেশের বাজার সুরক্ষা, মার্কিন পণ্য কেনা-মার্কিন কর্মচারী নিয়োগে অগ্রাধিকার দেয়া, মার্কিন কোম্পানীগুলোকে দেশে কারখানা খোলার কথা বলেছেন। তিনি ট্রান্সপ্যাসিফিক বাণিজ্য চুক্তি (টিপিপি) ও দক্ষিণ আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (নাফটা) বাতিলের পক্ষে। অভিবাসী নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাম্প মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন।

দেশের মধ্যে সংকট সামাল দিতে এবং চীনসহ অন্যান্য দেশের সস্তাশ্রমের সাথে টিকতে না পেরে মার্কিন শাসকরা এখন সংরক্ষণের শ্লোগান তুলছেন। ট্রাম্প তাঁর অভিষেক বক্তৃতায় একপর্যায়ে এমনও বলেন, 'protection will lead to great prosperity and strength'। সারাবিশ্বের বাজার, কাঁচামাল, শ্রমশক্তি শান্তিপূর্ণ পথে দখলের জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা এক সময় বিশ্বায়ন, মুক্ত বাণিজ্য, বাজার উদারিকরণের প্রবক্তা ছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতায় মার খাওয়ার আশঙ্কায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এরা আজ বাজার সংরক্ষণের পথে হাটছে। আর এর জন্য জাতীয়তাবাদী ধুয়ো তোলা হচ্ছে জোরেশোরে। বলির পাঠা বানানো হচ্ছে দরিদ্র অভিবাসীদের। এই ভাবেই শ্রমজীবি জনসাধারণের ঐক্য গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকেও বিনষ্ট করা হচ্ছে। এইজন্যই আমেরিকা ইউরোপসহ উন্নত দেশগুলোতে ডানপন্থী, জাত্যাভিমানী রাজনীতির শক্তি বাড়ছে। এদের অনেককে বলা হয় নব্য ফ্যাসিস্ট, কারণ হিটলারের নাৎসী পার্টির মতই এরা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও কর্তৃত্ববাদী শাসনে বিশ্বাসী। যেমন ট্রাম্প প্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা স্টিভ ব্যানন ছিলেন মার্কিন শ্বেত শ্রেষ্ঠত্ববাদী, বর্ণবাদীদের মুখপত্র ওয়েবসাইট ব্রেইটবার্ট নিউজের সম্পাদক।

পুঁজিবাদের মূল সংকট হল বাজার সংকট। সমাজে সবার শ্রমে উৎপাদিত সম্পদ যখন অল্প কিছু মালিকগোষ্ঠীর হাতে জমা হয় তখন উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে বাজার প্রসারিত হতে পারে না। কারণ অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা সীমিত থাকে। এই বাজারে আবার অনেক প্রতিযোগী। ফলে, উৎপাদনযন্ত্রের ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদনের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে সৃষ্ট সংকটকে ঢাকতে একেকবার একেক বিষয়কে সামনে আনা হয়। সংকট আপাতত কাটানোর জন্য তাৎক্ষণিক যে পদক্ষেপ নেয়া হয় পরবর্তীতে তা-ই আবার নতুন সংকট জন্ম দেয়। এইভাবেই ক্রমাগত অস্থিরতা ও নৈরাজের মধ্যেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চলছে। যেমন – ট্রাম্পের অভিবাসীবিরোধী পদক্ষেপ-এর বিরোধিতা করছে গুগল, মাইক্রোসফট, ফেসবুকসহ বড় বড় প্রযুক্তি শিল্পের মালিকরা। কারণ, অভিবাসীদের মেধা ও শ্রমের ওপর তারা নির্ভরশীল। এই ঘটনা মার্কিন বুর্জোয়াশ্রেণীর অভ্যন্তরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রতিফলন।

ট্রাম্পের বক্তব্য ও ভূমিকায় পরিস্কার – তিনি পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক, জাতিবিদ্বেষী, মুসলিমবিরোধী মনোভাবকে উসকে দিচ্ছেন। তাঁর কর্তৃত্ববাদী মনোভাব, জাতিদম্ভ, নারীর প্রতি অবমাননাকর বক্তব্য, বাগাড়ম্বর ও অহমিকাপূর্ণ আচরণ গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মার্কিন নাগরিকদের প্রতিনিয়ত আহত করছে। প্রচারমাধ্যম ও বিচারবিভাগকে আক্রমণ এবং আইনবিভাগকে পাশ কাটিয়ে নির্বাহীবিভাগের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার প্রবণতা ট্রাম্প প্রশাসনের কাজ-কর্মে দেখা যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে বুর্জোয়া শাসন আজ কতটা নগ্ন, প্রতিক্রিয়াশীল, গণতান্ত্রিক চেতনাবিরোধী হয়ে উঠছে – ট্রাম্প, মোদি বা আমাদের দেশসহ নানা দেশের কর্তৃত্ববাদী শাসকরা তার নিদর্শন।

প্রশ্নপত্র ফাঁস

(শেষ পৃষ্টার পর) অনেকেরই নেই। সত্যিকার অর্থে, তারা এসব ঘটনার শিকারমাত্র। কিন্তু যে বাবা-মা-শিক্ষক তাদের হাতে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন, তাদের দায়িত্বশীলতাকে আমরা কীভাবে দেখব? তারা যে নির্লজ্জের মতো ফাঁস হওয়া প্রশ্ন নিয়ে ছোটাছুটি করছেন, একটা ভালো রেজাল্টের জন্য সম্ভব সমস্ত ধরনের অন্যায়ের সাথে নিজেদের যুক্ত করছেন, কিংবা কিছু টাকা কামাচ্ছেন, তারা সন্তানের কোন ভবিষ্যৎ নির্মাণ করছেন? অভিভাবক-শিক্ষকদের এমন নৈতিক স্খলনে সন্তানদের কাছে কি তাদের শ্রদ্ধার আসনটি থাকছে? তাদের এই অধোগতি কি সন্তানদেরও বিপদগামী হতে শেখাচ্ছে না? একটা শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে মানুষকে অপরাধী করে তুলতে পারে, তা বোধহয় বাংলাদেশে বসবাস না করলে বোঝা যেত না।

এত কিছুর মধ্যেও যারা সততা এবং বিবেকের কারণে এমন নষ্ট পথে হাঁটছে না, সেইসব ছেলে-মেয়ে ও অভিভাবকদের কষ্ট সবচেয়ে বেশি। কেননা তাদের সন্তানদের অনেকেই ভালো ফলাফল করতে পারছে না। আমাদের দেশে ভালো ফলাফল মানে কতটা ভালো শিখেছে তা নয়, কতটা পয়েন্ট সার্টিফিকেটে যুক্ত হয়েছে সেটা। আর সার্টিফিকেট পাওয়াটাই যখন শেষ কথা, অভিভাবক-শিক্ষার্থীরা যেভাবেই হোক তা পেতে চেষ্টা করে। তাই সততা দেখিয়ে খারাপ ফলাফল মেনে নেয়া অনেকের জন্য বেশ কষ্টের। তাই তো আক্ষেপ করে কেউ কেউ বলে, এদেশে সততার কোনো মূল্য নেই।

সততা-নৈতিকতার মূল্য দেয় না যে রাষ্ট্র, যে সরকার, যে সমাজ; সমস্যার মূল শেকড় আসলে সেখানেই পোতা আছে। এমন সমাজই প্রতিদিন-প্রতিক্ষণ প্রশ্নফাঁসকারীদের জন্ম দেয়। তাদের লালন-পালন করে, প্রশ্রয় দেয়। যেমন, এবারও যখন প্রশ্নফাঁসের খবর এলো, সরকার যথারীতি অস্বীকার করে নানা আজগুবি ও হাস্যকর কথা বলতে লাগলো। অথচ ফেসবুকে সাধারণ মানুষ দেখিয়ে দিচ্ছিলো কোন কোন পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস হয়েছে। সবাই জানছে প্রশ্নফাঁসের কথা, আগের রাতে প্রশ্নও পেয়ে যাচ্ছে অনেকে। কেবল সরকার বুঝতে পারছে না। তারা অপেক্ষা করছে, কেউ অভিযোগ করলে তারা ব্যাপারটা খতিয়ে দেখবে। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমনকি এটাও ঘোষণা করেছিল, আসলে ফাঁস হওয়া পত্রগুলো সাজেশন মাত্র। হয়তো কাকতালীয়ভাবে ১/২টা মিলে গেছে। সরকার যখন এভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপন করে তখন দুটো ব্যাপার বোঝা যায়, এক তারা অপরাধীদের বাঁচিয়ে দিতে চায় এবং অন্যটি তারা নিজেরাও এসব কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত আছে। নাহলে এমন দায়বোধহীন কথা তারা বলতে পারতো না।

প্রশ্নফাঁসের সাথে জড়িয়ে আছে বিশাল শিক্ষাবাণিজ্য। লক্ষ-কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে একদল প্রতারক শিক্ষা ব্যবসায়ী। গত ২০১৫ সালের মেডিকেল পরীক্ষায় ১০ লাখ টাকা থেকে শুরু করে ২০০/ ৫০০ টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র বিক্রি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেসময় যেসব প্রশ্ন বাজারে পাওয়া গেছে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর দেখা গেছে মূল প্রশ্নপত্রের সাথে হুবহু মিল। পিএসসি, জিএসসি, এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষাতেও একই ঘটনা প্রতিবছরই ঘটছে।

প্রশ্নফাঁস এখন মহামারী আকার নিয়েছে। শুরু হয়েছে কিন্তু অনেক আগে। সরকারি এক হিসাবে দেখা গেছে, ১৯৭৯ সালে প্রথম এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়। ওই সময় থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সরকারি তথ্য অনুযায়ী ৮২ বার বিসিএসসহ বিভিন্ন চাকরি ও পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। ২০১৪ সালের জেএসসি, পিএসসি, এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। ২০১৫ সালে মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে। ২০১৬ সালেও পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ ২০১৭ সালের এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটলো। বেসরকারি হিসেবে এই সংখ্যা হয়তো আরও অনেক বেশি। এর মধ্যে পরীক্ষা স্থগিত, বাতিল ও তদন্ত কমিটি হয়েছে মাত্র ৩০টি পরীক্ষায়। এর মধ্যে কিছু তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আলোর মুখ দেখেনি। কিছু রিপোর্টে হোতাদের চিহ্নিত করে ও প্রশ্নফাঁস রোধে বিভিন্ন সুপারিশ করলেও তার বাস্তবায়ন হয়নি। কারও শাস্তিও হয়নি। আবার সারা দেশে আলোচনা শুরু হলে কিছু কোচিং সেন্টারের মালিক ও সাধারণ কিছু ব্যবসায়ীদের ধরে মানুষকে দেখানো হয়, বাস্তবে এরা মূল আসামী নয় 'মিডলম্যান' মাত্র। মূল আসামীরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। এবারও তাই করা হলো। এই যখন অবস্থা তখন বোঝাই যায়, কারা প্রশ্নফাঁসের পথকে অবারিত রাখছে এবং কারা শিক্ষার্থী-অভিভাবক সকলকে অপরাধী বানাচ্ছে।

মহান দার্শনিক ফ্রেডরিক এঙ্গেলস বলেছিলেন, ছুড়ি দিয়ে কাউকে হত্যা করলে বোঝা যায়। কিন্তু সমাজ যখন তিল তিল করে মানুষের মনুষ্যত্বকে খুন করে, তা হঠাৎ করে বোঝা যায় না। পরীক্ষার নামে প্রহসন করে একটা জাতিকে এভাবে প্রতিনিয়ত খুন করছে। যদিও অনেকেই এর ভয়াবহতা বুঝতে পারছে না। সরকার তার জনগণকে নির্জীব-কূপমণ্ডূক রাখতে চাইবে। এটাই স্বাভাবিক এবং এটা তার প্রয়োজনও। একটা রাষ্ট্রে ফ্যাসিবাদী শাসন চালাতে হলে এমন মানুষেরই চাষ দরকার। কিন্তু জনগণও যখন সেই একই তালে চলে তখন পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটানো কঠিন হয়ে পড়ে। আজ দেশের সকল অভিভাবক-শিক্ষার্থী-সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে, সাময়িক ভালো ফলের আশায় আমরা এক সর্বনাশা ভবিষ্যৎকে ডেকে আনছি। বাবা-মারা কি বুঝবেন না- এইভাবে সার্টিফিকেট পেয়ে একজন শিক্ষার্থী সামান্য আত্মবিশ্বাসী নিয়ে বড় হয়ে উঠতে পারে না? জ্ঞান-বিদ্যাহীন সার্টিফিকেট সর্বস্ব সন্তানই কি আমাদের কাম্য? এখনই যদি আমরা এ ব্যাপারে সতর্ক না হই, সামনে ভয়াবহ অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে। কেননা এরাই হবে আগামী দিনের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক বা অন্য কিছু। কাদের হাতে দেশটা যাচ্ছে, একবারও কি ভেবে দেখবেন না?

প্রসঙ্গ : বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন

(শেষ পৃষ্টার পর) নিয়ে আরো পশ্চাতে ঠেলে দিচ্ছে। যে দেশে আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সকল মানব সন্তানকে শিশু বিবেচনা করা হয়, সে দেশে ১৮ বছরের নিচে বিয়ের বিধান রাখা মানেই শিশু বিবাহকে বৈধতা দেয়া। নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সমস্ত কিছুকে হুমকির মধ্যে রেখে সরকার সংসদে দাঁড়িয়ে জনগণের মতকে তোয়াক্কা না করে শুধু নারী বিরোধী নয় জনবিরোধী বিশেষ বিধান রেখে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন পাশ করেছে। এদেশের সকল নারী সমাজ ও গণতন্ত্রমনা সকল মানুষ এই বিধানকে প্রত্যাখান করেছে।

নারী পুরুষ উভয়ের জন্য বিশেষ বিধান 'অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিয়ে' প্রযোজ্য করে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭' শীর্ষক বিলটি সংসদে পাশ হয়েছে। অবিলম্বে এই বিধান বাতিলের দাবি জানিয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪.৩০টায় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সীমা দত্তের সভাপতিত্বে ও দপ্তর সম্পাদক তাসলিমা নাজনীন'র পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঢাকা নগর শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এড. সুলতানা আক্তার রুবি, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিদীপা ভট্টাচার্য। সমাবেশে বক্তরা সমস্ত বিবেকবান ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এই আইন বাতিলের দাবিতে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, এটি কেবল নারীর অধিকার রক্ষার প্রশ্ন নয়, মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনাকে রক্ষার প্রশ্নও বটে।

ভারত কর্তৃক আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের প্রতিবাদে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাসদ (মার্কসবাদী) কুড়িগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে ভারত কর্তৃক আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের নামে বাংলাদেশকে মরুভূমি করার চক্রান্তের প্রতিবাদে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কুড়িগ্রাম জেলা শাখার সংগঠক মহির উদ্দিন আহমেদ মহিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, জল ও পরিবেশ ইন্সটিটিউটের সাবেক চেয়ারম্যান ম.ইনামুল হক, রিভারাইন পিপল'র মহাসচিব শেখ রোকন, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন'র কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলাম, কুড়িগ্রাম প্রেসক্লাবের সভাপতি মমিনুল ইসলাম মঞ্জু, দৈনিক প্রথম আলো কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি শফি খান, সলিডারিটি কুড়িগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক হারুন অর রশিদ লাল, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন'র সাবেক সভাপতি কামরুল আহসান খান, শিক্ষক আখতারুজ্জামান আখতার, ইসমাইল হোসেন, বাসদ(মার্কসবাদী) রাজারহাট উপজেলার সংগঠক জিয়াউর রহমান। মতবিনিময় সভা পরিচালনা করেন স্বপন কুমার রায়।

প্রশ্নপত্র ফাঁস

অবশেষে স্বীকার করলো শিক্ষামন্ত্রী !

পরীক্ষার আগের রাত। সন্তানকে নিয়ে পিতা-মাতা অপেক্ষা করছেন। কখন আসবে প্রতীক্ষিত বস্তু? কিছুক্ষণ পর পর ফেসবুকের নির্দিষ্ট কিছু পেজ কিংবা হোয়াটস্ আপে ঘোরাঘুরি। অবশেষে আকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নপত্রটি পাওয়া গেল। সবাই ভীষণ খুশি। এখন উত্তর বের করতে হবে দ্রুত। গৃহশিক্ষককে ডেকে এনে বা যেভাবেই হোক উত্তর বের করে মুখস্ত করানো হলো। পরদিন পরীক্ষাহলে গিয়ে দেখা গেলো সব কমন পড়েছে। ভালো পরীক্ষা দিয়ে সন্তান খুশি, বাবা-মা আরও বেশি খুশি।

না, এটা কোনো কষ্ট-কল্পনা নয়। আজকের বাংলাদেশে এসএসসি, এইচএসসি এমনকি জেএসসি-পিইসিতেও অনেক শিক্ষার্থীর জন্য এটা এখন পরিচিত ব্যাপার। চলমান এসএসসি পরীক্ষাতেও বাংলা, ইংরেজি, গণিতে ঘটেছে এমন ঘটনা। পরীক্ষার সময় এখন আর কষ্ট করে, রাত-দিন জেগে পড়াশুনা করতে হয়না বরং কিছুটা অর্থের কষ্ট স্বীকার করলেই সারা বছর কিছু না পড়েও পরীক্ষায় ভালো করা যায়, এমনকি এ প্লাসও পাওয়া যায়! সফল হওয়া এইসব শিক্ষার্থীরা ভি চিহ্ন দেখায়, সাংবাদিকরা ছবি তুলে, ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়। অনেক শিক্ষার্থী আছে হয়তো তারা কষ্ট করেই এই ফলাফল অর্জন করে, কিন্তু তাদের কষ্ট হারিয়ে যায় অনৈতিক এই সমাজে। তাই পাশের পর বিজয়োৎসব এখন আর কাউকে স্পর্শ করছে না। এই বিজয় যে আসলে কার বিজয় তা আজ বিবেকবান প্রতিটি মানুষকেই ভাবাচ্ছে। এমন একটা আদর্শহীন-নীতিহীন-ভবিষ্যৎহীন-ক্রিমিনাল প্রজন্ম কার প্রয়োজনে তৈরি হচ্ছে?

প্রতিবছর যে এমন ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে তার দায় আসলে কার? ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা, কিশোর-কিশোরীরা প্রশ্ন পাচ্ছে, পরীক্ষা দিচ্ছে। ন্যায়-অন্যায় বোঝার ক্ষমতা তাদের *(৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

প্রসঙ্গ : বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন

নারীদের অবরুদ্ধ জীবনের দিকেই ঠেলে দিল নারীর ক্ষমতায়নের সরকার!

আজ থেকে প্রায় একশত বছর আগে বিদ্যাসাগর নারীর প্রগতির পথকে সুগম করার জন্য পিছিয়ে পরা সমাজের জড়তা ভঙ্গে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন পাশ করিয়েছিলেন। তখন সমাজের কর্তাব্যক্তিরা বাল্যবিবাহ বন্ধে আইন মেনে নিতে পারেনি কিন্তু যারা এদেশ শাসন শোষণ করতে এসেছিল সেই ইংরেজ সরকার 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-১৯২৯' প্রণয়ন করেছিল। আর আজ নারী যখন নিজে তার পথের বাধা অতিক্রম করছে প্রবল প্রত্যয়ে, যখন সমাজের বেশিরভাগ মানুষ বাল্যবিবাহের কুফল তুলে ধরে এই অভিশাপ থেকে নিজেদের সন্তানদেরর রক্ষা করতে চাইছে তখন সরকার নারী প্রগতির কথা বলে তাকে আরও পিছিয়ে রাখার জন্য কূপম-ূক চিন্তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করছে। সরকার একদিকে উন্নয়ন, ডিজিটালাইজেশনের

৮ মার্চ ঢাকায় আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারীমুক্তি কেন্দ্রের মিছিল

শ্লোগান দিচ্ছে, আর অন্যদিকে নারীদের পশ্চাৎপদ সামাজিক অবস্থানকে পরিবর্তনের উদ্যোগ না *(৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ট্রাম্প যুগের রাজনীতি

নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভিন্ন পদক্ষেপ তার দেশে তো বটেই, সারা দুনিয়াতে প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। বিশেষতঃ ৭টি(পরে ৬টি) মুসলিমপ্রধান দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা এবং সকল অবৈধ অভিবাসীদের বহিষ্কারের ঘোষণা প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়েছে। ট্রাম্প তাঁর অভিষেক বক্তৃতায় "উগ্র ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সভ্য দুনিয়াকে ঐক্যবদ্ধ" করার কথা বলেছেন। ট্রাম্পের এইসব বক্তব্য ও পদক্ষেপের ফলে মুসলিম বিদ্বেষ আরো বাড়বে, যার প্রতিক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত মৌলবাদী গোষ্ঠী শক্তিশালী হবে। দুনিয়াজুড়ে ধর্মীয় ও জাতিগত সংঘাত-হানাহানি-যুদ্ধের বিস্তার ঘটিয়ে একদিকে অস্ত্রবাণিজ্যের বাজার নিশ্চিত করা, অন্যদিকে জনগণকে বিভক্ত করাই কি ট্রাম্প প্রশাসনের লক্ষ্য? আশার কথা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ বিরাট সংখ্যায় বিক্ষোভে নেমে মুসলিম ও অভিবাসী বিরোধী পদক্ষেপের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। ব্রিটেনসহ ইউরোপজুড়ে লক্ষ লক্ষ গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষসহ বামপন্থীরা সংখ্যালঘু ও অভিবাসীদের অধিকারের পক্ষে রাস্তায় নেমেছেন। ফলে ট্রাম্প অভূতপূর্ব গণবিক্ষোভের সামনে পড়েছেন শুরু থেকেই। বাস্তবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগেই, নির্বাচনী প্রচারের সময় থেকেই ট্রাম্পের জাতিদম্ভ-বর্ণবাদী-নারীবিদ্বেষী বক্তব্য ও চরম প্রতিক্রিয়াশীল গণবিরোধী রাজনীতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক বিক্ষোভ চলছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির জোরে। বিশ্ববাসী অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে দলেরই হোক, তাদের নীতি মোটামুটি একই থাকে। দেশে দেশে হস্তক্ষেপ-আধিপত্য বিস্তার, পছন্দমত শাসক পরিবর্তন, আগ্রাসন-যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার সাম্রাজ্যবাদী নীতি সব মার্কিন সরকারের আমলেই চলেছে। কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট-সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলেও কাজ করে সে দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতি-অতিকায় ধনকুবের গোষ্ঠী, বহুজাতিক কর্পোরেশন, সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের স্বার্থে। একজন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানীর ভাষায়, আমেরিকা চালায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল-মিলিটারী-ব্যুরোক্রেটিক কমপ্লেক্স। ইরাকসহ মধ্যপ্রাচ্য আগ্রাসনে লাভবান হয় তেল কোম্পানীগুলো। দেশে দেশে যুদ্ধ দরকার অস্ত্র কোম্পানী ও পেন্টাগণের স্বার্থে। এইসব ধনকুবের গোষ্ঠীর হাতেই প্রচারমাধ্যম ও বিনোদন শিল্পের মালিকানা, সাধারণত তারাই জনমত নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে, আজ ডোনাল ট্রাম্প মার্কিন নীতিতে না হলেও কর্মকৌশলে যে সব পরিবর্তন নিয়ে আসছেন তা মার্কিন শাসকশ্রেণীর গড় স্বার্থেই। এসব পদক্ষেপ-এর তাৎপর্য ভালভাবে বুঝা দরকার, কারণ আগামীতে সারা দুনিয়ায় এর প্রভাব পড়তে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বাজার সংকট থেকে বাঁচতে মার্কিন অর্থনীতির বড় অংশের সামরিকীকরণ করা হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক সমরাস্ত্র ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি কেনার মাধ্যমে বাজারে কৃত্রিম চাহিদা ও তেজীভাব সৃষ্টি করা হয়। এই রাষ্ট্রীয় সামরিক বিনিয়োগ ও অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধিকে গ্রহণযোগ্য করতে চাই যুদ্ধ বা যুদ্ধাতংক, চাই স্থায়ী শত্রু। একসময় ঠাণ্ডাযুদ্ধের নামে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা কমিউনিজমকে বিপদ হিসেবে দেখানো হত। বর্তমানে ইসলামী জঙ্গীগোষ্ঠী, চীন বা রাশিয়ার সাথে বিরোধকে জুজু হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ট্রাম্প এতোদিন ধরে মার্কিন প্রশাসন কর্তৃক অনুসৃত রাশিয়া বিরোধী নীতি পরিবর্তন করে রাশিয়ার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে চান। আইএসবিরোধী জোটের নামে মধ্যপাচ্যে সামরিক অভিযান চালানোর ক্ষেত্রে রাশিয়ার বিরোধীতা মোকাবেলা করা বা চীনের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে ব্যবহার করার কৌশল হিসেবে হয়তো তার এ পদক্ষেপ। কিন্তু ট্রাম্পের এই উদ্যোগ পেন্টাগন গোয়েন্দা বিভাগ, পররাষ্ট্র দপ্তর, প্রচারমাধ্যম ও *(৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org । ই-মেইল : mail@spbm.org